ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ২৬ সংখ্যা ।। ৯ ফাল্গুন, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

রাষ্ট্রপতির দরবারে গোরক্ষার স্বাক্ষরপত্র তুলে দিতে উপস্থিত গো-গ্রাম যাত্রার নেতৃবৃন্দ। (বাঁদিক থেকে) কেশরীচাঁদ মেহেতা, ডাঃ এইচ আর নাগেন্দ্র, হুকুমচাঁদ সাঁওলা, সীতারাম কেদিলাই, স্বামী বিজয়মিত্র চৈতন্য, রাহুল বোধি, স্বামী পরমাত্মানন্দ, সাধ্বী ঋতাম্ভরা, কে এস সুদর্শন, শঙ্করাচার্য শ্রীরাঘবেশ্বর ভারতী, বাবা রামদেব, পেজাবর স্বামী বিশেষতীর্থ, ঋষিপাল দাদওয়াল, যশবীর সিং নামধারী, আদেশ গোয়েল, ছোটে মিঞা মৈনুদ্দিন সাবরি, দিবাকর শাস্ত্রী, সর্দার যোগিন্দর সিং, সবার মাঝখানে রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল। এদিন সকলে রাষ্ট্রপতির কাছে গোরক্ষার জন্য ৮.৩৬ কোটি ভারতবাসীর দাবী সম্বলিত স্বাক্ষরপত্র তুলে দেন।

মুসলিম সংরক্ষণে ক্ষুব্ধ হিন্দুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মুসলিমদের জন্য রাজ্যে পৃথকভাবে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের ঘোষণা করে পশ্চিমবঙ্গকে এক ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিল সিপিএম। রাজ্য সরকারের এই ঘোষণায় হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এরমধ্যেই তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সরকারি হিসাবেই এরাজ্যের প্রায় অর্ধেক মানুষ এখনও বিপিএল তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ৮ কোটি জনসংখ্যার ৬ কোটি এখনও হিন্দু। সুতরাং দরিদ্র হিন্দু পরিবারের সংখ্যাই বেশি। হিন্দুদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার মূল কারণ এটিই। গরীব হিন্দুর চাকরি পাওয়ার পথ সংকুচিত করে বড়লোক মুসলমানদের সরকার ১০ শতাংশ চাকরির নিরাপত্তা দিচ্ছে। বছরে সাড়ে চার লক্ষ টাকা রোজগেরে হিন্দু পরিবার রাজ্যে কত আছে? কিন্তু বছরে সাড়ে চার লক্ষ টাকা রোজগার হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেইসব মুসলিম সম্প্রদায়কে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী হিসাবেই দেখছে। সিপিএম তথা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ভুলে গিয়েছেন, শুধু মুসলিম ভোট পেয়েই তিনি মহাকরণের অধিপতি হননি। হিন্দুরা আপনার সমস্ত পদক্ষেপ নজর রাখছে। গত দু'বছর ধরে এরাজ্যের প্রশাসন প্রতিটি সরকারি প্রকল্পে মুসলিমদের জন্য অলিখিত সংরক্ষণ দিয়ে চলেছে। বেনিফিসিয়ারিদের তালিকায় আলাদা করে মুসলিম কোটা চালু হয়েছে। সে ইন্দিরা আবাসের ঘর হোক কিংবা ১০০ দিনের কাজ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নির্লজ্জভাবে সরকারি চাকরিতে যেভাবে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করেছেন তাতে রাজ্যে আগুন জ্বলার পরিস্থিতি তৈরি হলো। এমনিতেই রাজ্যে ২২ শতাংশ তফসিলি জাতি, ৬ শতাংশ তফসিলি

(এরপর ৪ পাতায়)

মুসলিম সংরক্ষণের প্রতিবাদে কলকাতায় বিজেপি-র বিক্ষোভ মিছিল।

ভোট হারানোর ভয়ে কংগ্রেসের জেহাদি তোষণ

।। গুঢ়পুরুষ ।। মুম্বাইয়ের পর পুণেতে জেহাদি সন্ত্রাস। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট বলছে, পাকিস্তানের মাটি থেকে কার্যকলাপ চালানো লস্কর-এ-তৈবা এবং তার সহযোগী ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন-এর সাদার্ন ব্রিগেড পুণের বোমা বিস্ফোরণের জন্য দায়ী। পাক গুপ্তচর সংস্থা আই এস আইয়ের মদত ছাড়া এমন শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব ছিল না। গত ২০০৮ সালে দিল্লি ও মুম্বাইতে যে বিস্ফোরণ এবং হামলা হয় সেই ঘটনায় লস্কর এবং আই এস আই যুক্ত ছিল তা স্বীকৃত সত্য। দিল্লির বিস্ফোরণ পাক লস্করের নির্দেশে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন ঘটিয়েছিল। লস্কর ছাড়াও পাকিস্তানের মাটি থেকে ভারতে ক্রমাগত নাশকতা চালাচ্ছে হিজবুল

ভারত নিরাপদ নয়

মুজাহিদিন এবং জইশ-ই-মহম্মদ। এরা সকলেই আমেরিকা নয়, ভারতকেই ইসলামের এক নম্বর শত্রু বলে মনে করে। ঠিক এখানে তাদের সঙ্গে আফগানিস্তানে লাদেনপন্থী তালিবানদের তফাৎ। তারা মনে করে আমেরিকা ইসলামের প্রধান শত্রু।

এতসব কাণ্ডের পরেও কেন্দ্রে কংগ্রেসের জোট সরকার আজ পর্যন্ত নাশকতায় দণ্ডিত জেহাদিদের শাস্তি দিতে ক্রমাগত গড়িমসি করেই চলেছে। ভারতীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান সংসদ ভবনে হামলা চালানোর ঘটনায় গ্রেফতার ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত জেহাদি সর্দার আফজল গুরু আজও বহাল তবিয়তে জেল থেকে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ চালাচ্ছে। তার ফাঁসির আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট দিলেও বিগত চার বছর কেন্দ্রের কংগ্রেস জোট সরকার মৌনী হয়ে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং তাঁর দলের নেত্রী সোনিয়া গান্ধী মনে করেন আফজল গুরুকে ফাঁসি দিলে কংগ্রেস মুসলিম ভোট হারাবে। অর্থাৎ দেশ নয়, মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক অটুট রাখাই শাসক কংগ্রেস দলের আসল লক্ষ্য।

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

মাওবাদী শিবিরে মহিলা ক্যাডাররাও যৌন শোষণের শিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ''মাওবাদী আন্দোলনের কোনও ভবিষ্যতই নেই। আমি এখন একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। মাওবাদীরা নীতি-আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তারা ডাকাত, তোলাবাজ ও হত্যাকারীতে পরিণত হয়েছে। দাদারা কথা দিয়েছিলেন। ভারত সরকারকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। সে স্বপ্ন সুদূরপরাহত।'' এভাবেই নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মন্তব্য করেছে পাঁচবছর জঙ্গলে কাটানো কট্টর মাওবাদী মহিলা ক্যাডার পোরিয়াম পোঝে। পোঝে মাওবাদীদের গড় বলে পরিচিত ছত্তিশগড় প্রদেশের বস্তার জেলার মুরিয়া জনজাতি সম্প্রদায়ের। মাওবাদে মুরিয়া জনজাতি দুহিতা পোরিয়াম পোঝে আর কোনওরকম কার্যকারিতা খুঁজে পাচ্ছে না। মাওবাদীদের সশস্ত্র সংগঠন 'বিজয় দলম্'-এর সদস্যা পোঝের সঙ্গে রয়েছে সর্বক্ষণের সঙ্গী ১২ বোরের বন্দুক।

দক্ষিণ ছত্তিশগড়ের জঙ্গলাকীর্ণ বস্তার জেলার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা মাওবাদীদের শক্ত ঘাঁটি। পোরিয়াম আরও বলেছে—বস্তার জেলাতে দাদারা এখন ব্যক্তিবিশেষ ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তোলা আদায় করছে এবং নির্দোষ লোকেদের হত্যা করছে।

যারা শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে তারাও শোষণে পিছপা হয় না। পোরিয়াম জানিয়েছে, মাওবাদী শিবিরে মহিলা ক্যাডাররা অত্যধিক যৌন শোষণের শিকার। পোঝের মাতৃভাষা গোণ্ড, সে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে তার বক্তব্য রাখছিল। নিজমুখে আরও জানিয়েছে, সে জবরদস্তি যৌন অত্যাচারের নীরব সাক্ষী। তার সঙ্গেও অনেকবার দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। মা-বাবারা কম বয়সী ছেলে-মেয়েকে মাওবাদীদের হাতে তুলে না দেওয়ায় এরকম অনেক ছেলে-মেয়েকে মাওবাদীরা হত্যা করেছে। 'নির্মম হত্যা থেকে দূরে থাকতেই আমি সমাজজীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি— পোঝের বক্তব্য।'

সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় জনাকয়েক পুরুষ মাওবাদী গেরিলা উপস্থিত ছিল। পাঁচবছর আগে মাওবাদীরা তাকে জোর করে ঘর থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

এটা সেই সময়ের কথা যখন মাওবাদীরা প্রত্যেক বাড়ি থেকে একজনকে তাদের সঙ্গে জোর করেই সামিল করছিল। পোরিয়াম বলেছে, ''একবছরের মধ্যেই ১২ বোরের বন্দুক থেকে গুলি চালাতে শিখে যাই। পুলিশকে আমি ভয় পাই না। বস্তার জেলাতে অন্তত ছয়টি প্রধান হামলাতে আমি যুক্ত ছিলাম। এই লুট এবং হিংসার কোনও শেষ নেই। আমি গ্রামে ফিরে যাওয়ার জন্য মনস্থির করে ফেলেছি। আমার অভিজ্ঞতা হল, মাওবাদীদের কোনও আদর্শই নেই। শিবিরে শিবিরে মহিলা কাডারদের জবরদস্তি যৌন উৎপীড়ন এবং শোষণ চলে।'' পোরিয়াম পোঝে এখন বিয়ে করতে চায়। সে এখন মনের মানুষ খুঁজছে। দাদারা মুখে প্রভাবিত এলাকা বাড়ার কথা বললেও গত একবছরে তারা মারাত্মক পুলিশী চাপের মুখে পড়েছে। প্রভাবিত এলাকার পরিধি ক্রমশ কমে আসছে বলেও পোঝে জানিয়েছে।

এই সময়

করলামৃত

করলা খাচ্ছেন তো? সেইসাথে উচ্ছে? বাঁচতে গেলে তো খেতেই হবে। তবে এখন খান। আর তেতো মনে হবে না। তবে কিনতে গেলে তেতো ঠেকবেই ঠেকবে। কারণ আপাতত কেজি প্রতি আশি টাকাতেই বিকোচ্ছে উচ্ছে কিংবা করলা। তবে অমৃত মনে করে খান। কষ্ট হবে না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবেন, করলামৃত সেবন করছি, থুড়ি খাচ্ছি।

তৈলমর্দন

আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যারেল পিছু তেলের দাম বেড়ে গিয়েছে বেশ খানিকটা। কিন্তু ভারতে বাড়ছে না এখনই। আসলে শরিকদের চাপে পড়েই তেলের দাম বাড়াতে পারছে না সংস্কারপন্থী ইউ পি এ সরকার। একদিকে মজুতদারী, অন্যদিকে কালোবাজারী—দু'য়ের জাঁতাকলে পড়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও খাদ্যশস্যের দাম কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে হুহু করে। ব্যর্থ সরকার তার ব্যর্থতা ঢাকতে সরকারি কোষাগার থেকে ভর্তুকি গুণাগার দিয়ে কৃত্রিমভাবেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছে অপরিশোধিত তেলের দাম। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী মুরলী দেওরা ও অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক বৈঠকে ঠিক হয়েছে নির্বাচকমণ্ডলীকে তৈল-মর্দন করা আশু-কর্তব্য, সুতরাং তেলের দাম বাড়ানো হবে না এখনই।

ধ্রুব সত্য

স্রেফ ধর্ষিতার বক্তব্যকেই এখন থেকে আর 'ধ্রুব সত্য' মেনে নিয়ে বিনা বিচারে কাউকে 'ধর্ষক' বলে পরিগণিত করবে না আদালত। যদি না পারিপার্শ্বিক তথ্য-প্রমাণাদি সাক্ষ্য দেয় যে সত্যিই তিনি ধর্ষিতা কিংবা ধর্ষিতার বক্তব্য অনুযায়ী অমুক লোকই ধর্ষক। সম্প্রতি একটি ধর্ষণের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি এইচ এস বেদী ও জে এম পাঞ্চালকে নিয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দেন। তবে বিচারকরা এও বলেছেন—ধর্ষিতার বক্তব্যের একটা ন্যূনতম সত্যতা রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধরে নেবে আদালত।

চৈতন্যোদয়

মাওবাদ নাম অক্টোপাসের ফাঁদ কেটে বেরোতে চাইছে নেপাল। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি চীনের ছায়া থেকে বেরিয়ে পুনরায় ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। তাতে আখেরে অন্তত লাভ হবে নেপালেরই। আর এই সারসত্যটুকু বুঝে নেপালের প্রেসিডেন্ট রামবরণ যাদব বলেছেন—তাঁর সফরের পূর্বেই যেন ভারত নেপালকে শান্তি-প্রতিষ্ঠার লক্ষে সহায়তা করে। বলাই বাহুল্য, মাও-নেপালে শান্তি দূর-অস্ত। ভারতীয় সহযোগিতায় যদি হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে নেপাল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় তবেই হয়তো শান্তি ফিরবে। তাই এখন ভরসা রামবরণের চৈতন্যোদয়টুকুই।

বি টি দ্বৈরথ

বি টি বেগুন নিয়ে জোর লড়াই বেঁধেছে পরিবেশ ও বনমন্ত্রী জয়রাম রমেশ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ চৌহানের মধ্যে। সম্প্রতি বি টি বেগুনকে 'নিরাপদ' বলার পরেও কৃষকদের আন্দোলনের চাপে এনিয়ে পুনরায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয় জয়রাম রমেশের দপ্তর। আর এতেই চটেছেন পৃথ্বীরাজ। চৌহানের বক্তব্য— বার বার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করালেও ফলের পরিবর্তন সম্ভব নয়। তবে দ্বৈরথটা আসলে বি টি বেগুন নিয়ে নয়। লড়াইটা দুই মন্ত্রকের, পরিবেশ মন্ত্রক বনাম বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মন্ত্রক। প্রশ্ন হলো, এই দুই মন্ত্রকের মধ্যে বি টি বেগুন নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অধিকার আছে কার?

উত্তুঙ্গ মুদ্রা-তরঙ্গ

মুদ্রা-রাক্ষস বলে মুদ্রা-স্ফীতিকে লজ্জায় ফেলবেন না। এ নিয়ে কংগ্রেসী ভেল্কিবাজির ওপর দারুণ আস্থা রেখেছিল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তারা 'ফোরকাস্ট' করে বলেছিল জানুয়ারি মাসে মুদ্রাস্ফীতির হার ৮.৫ শতাংশে পৌঁছে যাবে। কিন্তু সেই 'ফোরকাস্টে'র মুখে বেশ কিছুটা চুনকালি ফেলে জানুয়ারিতে মুদ্রাস্ফীতি পৌঁছল ৮.৫৬ শতাংশে। গত ১৩ মাসে এটাই সর্বোত্তম। শীতের সব্জির মরসুমেও মুদ্রা-তরঙ্গের অভিমুখ উত্তুঙ্গ। সব্জিহীন গ্রীষ্মে অপেক্ষায় থাকুন মুদ্রাস্ফীতি নামার 'প্রণবানন্দ ম্যাজিকে'।

টনক নড়েনি

অবশেষে কি টনক নড়ল কেন্দ্রীয় সরকারের? অরুণাচল নিয়ে চৈনিক হুমকিকে আর হেসে উড়িয়ে দিতে পারছে না নয়াদিল্লী। সেইজন্য কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনি গত ১৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লীতে অরুণাচল প্রদেশের দুটি অতিরিক্ত পর্বত-শৃঙ্গে সৈন্য সমাবেশের কথা ঘোষণা করেছেন। অবশ্য ওইদিন একইসাথে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী এটাও বলেছেন যে চীন যেন ভারতকে যুদ্ধ বাজ বলে না ভাবে। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলতে বাধ্য হচ্ছেন—টনক নড়েনি ইউ পি এ-র।

বিচারের বাণী

'৮৪-এর ভয়ংকর শিখ-বিরোধী দাঙ্গায় স্বজন হারানো শিখেরা ভরসা রাখতেই পারেন দিল্লী হাইকোর্টের ওপর। কারণ এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সজ্জন কুমারের আগাম জামিনের আবেদন গত ১৫ ফেব্রুয়ারি বাতিল করে দেয় দিল্লী হাইকোর্ট। কংগ্রেস এবং গান্ধী (ইন্দিরা) ভক্তরা এই ব্যাপারটা নিয়ে গত লোকসভা নির্বাচন থেকে এখনও পর্যন্ত বহুবার গাড্ডায় পড়েছেন। কিন্তু বিচারের বাণী এখনও নীরবে নিভৃতে কেঁদেই চলেছে।

ভুল সময়

মার্কিন চাপের কাছে নতিস্বীকার করে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং তাঁর 'অকালকুষ্মাণ্ড বিদেশনীতি'র দরুণ পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা চাইছেন। বিজেপি নেতা আদবাণী এর কড়া সমালোচনা করে বলেছেন—সময়টাই ভুল। ২৬/১১ কিংবা সাম্প্রতিককালে পুণের জার্মান বেকারীর ঘটনা এই 'ভুল সময়'-এর চরমতম নিদর্শন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সন্ত্রাসবাদের প্ররোচকের সঙ্গে শান্তি আলোচনার ভিত্তি কী হবে?

আবার সন্ত্রাসবাদী হামলা। এবার হামলার স্থল পুণে। মোরেগাঁও পার্কে জার্মান বেকারী। নিকটস্থল ইহুদি অধ্যুষিত। দুইশত গজের মধ্যেই রহিয়াছে ইহুদিদের প্রার্থনাস্থল চাবাস ভবন। জার্মান বেকারীতে ছিল বহু বিদেশীদের আনাগোনা। ইহুদি সংখ্যাই স্বভাবত অধিক। গত শনিবার ১৩ ফেব্রুয়ারি '১০ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ হঠাৎই বিস্ফোরণ, চিৎকার, চেঁচামেচি, হাহাকার, মরণকান্নায় এলাকা স্তম্ভিত। তারপরের চিত্র আর সবকটি বিস্ফোরণ স্থলের মতোই একই। পুলিশ, দমকল, গোয়েন্দা কুকুর আর গণমাধ্যমের সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারদের আনাগোনা। সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে একে একে নেতা-নেত্রী-আমলা বাহিনীর মুখ দেখানো আর বিবৃতিদান।

এই পরিচিত দৃশ্যে আমরা অভ্যস্তই হইয়া গিয়াছি। ইসলামের নামে গজাইয়া ওঠা কিছু সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের মানুষ বিরামহীন হত্যা লীলা বছরের পর বছর ধরিয়া চালাইয়া যাইবে। "দার-উল-ইসলাম" (ইসলাম রাষ্ট্র)-এর দাবীতে গড়িয়া ওঠা পাকিস্তান এই জিহাদীদের স্বাভাবিকভাবেই অস্ত্র, অর্থ ও ভূমি দিয়া তাহাদের সাহায্য করিবেই। "দার-উল-হারব" অর্থাৎ "শত্রুভূমি" ভারতের উপর হামলা, হত্যা ও ষড়যন্ত্র যেন তাহাদের পবিত্র কাজ, জন্মসূত্রে ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের কাছে হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে হিংস্র ষড়যন্ত্র করা বিনা আর কিছু আশা করা বৃথাই শুধু নয়, অন্যায়ও।

এই অন্যায়ই কংগ্রেস সরকার বরাবরই করিয়া চলিয়াছে। তোষামোদ করিয়া শয়তানকে কখনও সংযত করা যায় না। এই সত্য কবে যে উপলব্ধি করিবে ভগবানই জানেন। যত তাড়াতাড়ি জানেন ততই মঙ্গল। তবে অদূর ভবিষ্যতে তাহা হইবে বলিয়াও আশা কম। কারণ ক্ষমতা দখল। মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের তোষণ করিলে যদি সমগ্র মুসলিম সমাজের ভোট পাওয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার সহজ উপায় আর কী হইতে পারে? অপর দিকে বিজেপি এখনও পর্যন্ত সমগ্র হিন্দু সমাজের একমাত্র ত্রাতা হইয়া উঠিতে পারে নাই। স্বভাবগতভাবে সেটা বোধ হয় সম্ভবও নয়। জাতি হিসাবে হিন্দুদের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের বড়ই অভাব। যে কোনও জাতি এবং প্রজাতির মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতা এবং জাতীয় ঐক্য এক স্বাভাবিক প্রবণতা। দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের ঐক্যের বড়ই অভাব। আজও গড়িয়া ওঠে নাই। হাজার হাজার বছরের বঞ্চ না, প্রবঞ্চ না, অত্যাচার, অনাচার আর অবহেলার শিকার হইয়াও হিন্দুজাতির কোনও শিক্ষা হয় নাই। তাই কংগ্রেসীরা দুঃশাসন আর দুর্যোধনদের পদলেহন করিবার প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে।

সাম্প্রতিক ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে মুম্বাই, পুণে, দিল্লী এবং ভারতের একের পর এক শহরে হত্যালীলা চালাইয়াও পাকিস্তানী জেহাদীদের বিরুদ্ধে সামান্যতম সামরিক পদক্ষেপও কংগ্রেস সরকার গ্রহণ করিতে পারে নাই। মুম্বাই বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত জেহাদী সন্ত্রাসবাদীদের নামধাম প্রমাণসহ পাকিস্তানের কাছে দাখিল করিলেও পাকিস্তান আজ পর্যন্ত একটি জেহাদীকেও ভারতের হাতে তুলিয়া দেয় নাই। নির্বাচনী বৈতরণী পার হইয়া কংগ্রেস দল ধীরে ধীরে সুর নরম করিয়া চলিয়াছে। এমনকী শার্ম-এল-শেখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের ফাঁদে পা দিয়া ভারতও পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে ইন্ধন যোগাইতেছে, একথা যৌথ বিবৃতিতে স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। আজব ব্যাপার! কবে আবার ভারত তথা হিন্দুস্থান অন্য দেশে হিংস্রতা রপ্তানী করিল? এই নতুন তথ্য মনমোহনজী মানিয়া লইলেন কী করিয়া?

পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা শুধু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে পাকিস্তানের হস্তক্ষেপ বন্ধের দাবীতেই হইতে পারে। আর কোনও অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক সুবিধা দানের চুক্তি যেন না করা হয়। সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করিবার বিনিময়ে শুধু এই সকল চুক্তি করা যাইতে পারে। সন্ত্রাসবাদকে বাদ দিয়া কোনও বিষয় মীমাংসা বা সুবিধাদান নয়। সন্ত্রাসবাদ আর আলোচনার এক সঙ্গে চলিতে দেওয়া চলে না। পাকিস্তান কিন্তু সন্ত্রাসবাদকে বাদ দিয়াই সার্বিক আলোচনার পক্ষপাতী। আগবাড়াইয়া সে আলোচনায় আসেও নাই। ভারতই উপযাচক হইয়া আলোচনার প্রস্তাব দিয়াছে। স্পষ্টতই আমেরিকার চালবাজি রহিয়াছে ইহার পিছনে। তাহারাই আফগান-পাকিস্তান স্ট্র্যাটেজী হিসাবে ভারতকে পণবন্দী করিতে চায়। তাহা না হইলে পুণেতে ইহুদি হত্যাতেও তাহার গা নাই কেন?

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

ধর্মের রক্ষা—জগতের সম্মুখে হিন্দুধর্মের রক্ষা ও অভ্যুত্থান, আমাদের সামনে এইটিই হলো কাজ। কিন্তু ধর্ম কী? এই যে ধর্মকে আমরা বলি সনাতন, সর্বকালীন এই ধর্ম কী? এ হিন্দুধর্ম, কেবল এই জন্যেই যে, হিন্দুজাতি এই ধর্মকে ধরে রেখেছে। হিমালয় ও সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত এই উপদ্বীপে নিরালায় এই ধর্ম গড়ে উঠেছে। এই পুণ্য ও প্রাচীন ভূমিতে আর্য জাতির উপর ভার দেওয়া হয়েছিল এই ধর্মকে যুগ যুগান্তরের ভিতর দিয়ে রক্ষা করতে। কিন্তু ইহা কোনও একটি দেশেরই গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, জগতের কোনও একটি সীমাবদ্ধ অংশের জন্যই বিশেষভাবে এবং চিরকালের জন্য এ ধর্ম নয় যাকে আমরা হিন্দু ধর্ম বলি। বস্তুত সেটি হচ্ছে সানাতন ধর্ম, কারণ সেটি বিশ্বজনীন ধর্ম, অন্য সকল ধর্মই তার অন্তর্গত। কোনও ধর্ম যদি সার্বজনীন না হয়ে তবে তা সনাতন হতে পারে না। কোনও সংকীর্ণ ধর্ম, সাম্প্রদায়িক ধর্ম কেবল স্বল্পকাল ও সীমাবদ্ধ সামান্য উদ্দেশ্যের জন্যই জীবিত থাকতে পারে। এইটিই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম বা বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও দার্শনিক চিন্তাধারা যা সকলের পূর্বাভাস দিয়ে তাদের নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে জড়বাদের উপর জয়ী হতে পারে।

—ঋষি অরবিন্দ

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতির মতোই দিশাহীন

এন সি দে

গত ২৯ জানুয়ারি ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শ্রীডুভুরি সুববারাও ২০০৯-১০ অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টারের মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছেন। এই মুদ্রানীতি পর্যালোচনায় শ্রীসুববারাও নাকি আর্থিক সংকট মোকাবিলা থেকে এবার আর্থিক উত্থানের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। তাঁর মতে আর্থিক উন্নয়ন অনুমান করা হয়েছিল হবে ৬ শতাংশ, কিন্তু হয়েছে ৭ শতাংশ। কিন্তু আর্থিক উন্নয়ন যদি কল্পনার থেকেও বেশী হয়ে থাকে তবে শিল্পপতি, মার্কিন ও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগী ব্যবসায়ীদের আর্থিক অনুদানের হরির লুঠের কোটি কোটি টাকা দেওয়ার প্যাকেজ বন্ধ করছেনা কেন? দ্বিতীয়ত, আর্থিক উন্নয়ন মানে তো শিল্পোৎপাদন বাড়ানো যার মাধ্যমে ঘরোয়া চাহিদা মিটিয়ে বাইরে বাণিজ্য বাড়ানো অর্থাৎ আমদানির চেয়ে রপ্তানী বাণিজ্য বাড়ানো। কে না জানে আমদানি করা মানে কেনা। আর কিনলেই পকেট থেকে টাকা-পয়সা বেরিয়ে যায়। আর রপ্তানী করা মানে বিক্রি করা। আমরা সকলেই জানি বিক্রি করলেই পকেটে টাকা পয়সা আসে। ভারত ছাড়া দুনিয়ার সব দেশই জানে যে আমদানি কম করা উচিৎ আর রপ্তানী বেশী করা উচিৎ। একে অর্থনীতির ভাষায় বলে Balance of Trade অর্থাৎ বাণিজ্যে ভারসাম্য। এই ভারসাম্য নিজের অনুকূলে বজায় রাখলে আর্থিক ভারসাম্যও নিজের অনুকূলে থাকে। একে বলে Balance of Payment অর্থাৎ আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য। এই ভারসাম্য নিজের অনুকূলে বজায় রাখলে আর্থিক স্ফীতি হয়। একে বলে Trade Surplus। আর যদি ভারসাম্য নিজের বিরুদ্ধে চলে যায়, তবে তাকে বলে Trade Deficit বা বাণিজ্যিক ঘাটতি। ভারতে, স্বাধীনতার কয়েক বছর পর থেকেই, এই বাণিজ্যিক ঘাটতি চলেই আসছে। যার ফলে ঘটছে আর্থিক ঘাটতি যাকে অর্থনীতির ভাষায় বলে Deficit financing। এর ফলে প্রতি বছর আমরা পাচ্ছি ঘাটতি বাজেট বা Deficit Budget।

শ্রীসুববারাও বলেছেন, আর্থিক উন্নয়ন ৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭ শতাংশ। কি করে হলো? বাণিজ্যিক ঘাটতি কি মিটে গেছে? রপ্তানী বাণিজ্য কি আমদানী বাণিজ্যের চেয়েও বেশী হয়েছে? আসুন দেখি পরিসংখ্যান কী বলছে! সদ্য প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে ডিসেম্বর '০৯ পর্যন্ত আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ হচ্ছে ১৪.৬ বিলিয়ন ডলার; সে জায়গায় আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৪.৮ বিলিয়ন ডলারে। অর্থাৎ রপ্তানী করে অর্থ এসেছে ১৪.৬ বিলিয়ন ডলার আর আমদানী করে অর্থ চলে গেল ২৪.৮ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ বাণিজ্যিক ঘাটতি হয়েছে ১০.২ বিলিয়ন ডলার। তাহলে আর্থিক উন্নয়ন হলো কিভাবে? সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৮-০৯ বর্ষে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মিলিত আর্থিক ঘাটতি ২০০৭-০৮ বর্ষের চেয়ে ৪.২ শতাংশ বেড়ে হয়েছে জি ডি পি'-র ৯ শতাংশ। রপ্তানী বাণিজ্য '০৮-০৯ বর্ষের তুলনায় ২০০৯-১০ বর্ষে কমে হতে চলেছে ১৭৫ বিলিয়ন ডলার। ছিল ১৮৫ বিলিয়ন ডলার।

মনে রাখা দরকার যে এই পরিসংখ্যান এবার তৈরী হয়েছে ২০০৪-০৫ বর্ষকে ভিত্তি-বর্ষ হিসাবে ধরে। এতদিন এই ভিত্তিবর্ষ ছিল ১৯৯৯-২০০০। এই নতুন ভিত্তিবর্ষ হিসাবে সব ধরনের ঘাটতিকে কম করে দেখানোর সুযোগ মিলবে সরকারের। কয়েক বছর যাবৎ আমাদের দেশের সরকারগুলিতে (কি রাজ্যের, কি কেন্দ্রের) উকিল আর অর্থনীতিবিদদেরই রমরমা। কারণ এনারাই ভাল পরিসংখ্যান তৈরি করতে পারেন। যিনি যত বেশী পরিসংখ্যানে কারচুপি করতে পারেন তিনি তত বড় পরিসংখ্যানবিদ বলে খ্যাত হন। কেউ কেউ বলেন, এরা এক একজন বড় statistical juggler অর্থাৎ পরিসংখ্যান জাদুকর। যখন যেমন পরিসংখ্যান দরকার সেইমতো পরিসংখ্যানের জাদুতে এরা মানুষকে বিভ্রান্ত করেন। ভিত্তি বর্ষের পরিবর্তন এমনই একটি জাদুকরি পদক্ষেপ।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলেছে আর্থিক উন্নয়ন হয়েছে। তাহলে শিল্পোৎপাদনও নিশ্চয়ই বেড়েছে। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পেলে মূলধন যোগানের প্রয়োজন বাড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেল মূলধন যোগানের মূল উৎস ব্যাঙ্কের হাত থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৩৬,০০০ কোটি টাকা কেড়ে নিল কেন? মুদ্রাস্ফীতির ভয়ে? কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি না থাকা সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি হলো কিভাবে? সরকারী পরিসংখ্যানেই দেখা যাচ্ছে ডিসেম্বর '০৯ মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই খাদ্য মূল্যসূচক পৌঁছে গেছে ২০ শতাংশের কাছাকাছি। এই দশকের সর্বোচ্চ। ভুললে চলবে না এটা প্রথমত, সরকারি পরিসংখ্যান; দ্বিতীয়ত, এটা ধরা হয়েছে পাইকারী মূল্যভিত্তিক সূচক হিসাবে (wholesale price-based index); খুচরো বাজারের ভোগ্য-পণ্যভিত্তিক সূচক (Consusmer Price-based index) হিসাবে নয়। আমাদের আর এক কৃষি পরিসংখ্যানবিদ (?) কৃষিমন্ত্রী শরদ পাওয়ার বলেছেন, এই অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ হলো মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি। অর্থাৎ তিনিও মার্কিন রাষ্ট্রপতির মতো ঘুরিয়ে বলেছেন ভারতের মানুষ এখন বেশি খাচ্ছেন। তাই এই খাদ্য সংকট। এই কথা বলার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সারা দেশের সমস্ত দল ও পত্র-পত্রিকা সোচ্চার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল। আজ শরদ পাওয়ারকে ছেড়ে দেওয়া হবে কেন? শরদ পাওয়ার কি মনে করেন মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়া উচিৎ নয়? সাধারণ মানুষের ধারণা কিন্তু ভিন্ন। দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ার মানে হলো প্রয়োজনভিত্তিক নিত্যপণ্যের বাজারে চাহিদা বাড়া এবং সেই কারণে কৃষিপণ্যের বাণিজ্যে তেজীভাব আসে। আসলে কংগ্রেস সরকার কোনওদিনই কৃষির উন্নতি চায়নি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গঠিত ব্যাস কমিটির রিপোর্টে বলেছে, ১৯৯১ সালে কংগ্রেস সরকারের ঘোষিত আর্থিক সংস্কার কর্মসূচীর ১৫ বছরে দেখা যাচ্ছে শিল্প ও কৃষিতে নয়, সরকারের নির্দেশে ব্যাঙ্কগুলি হাউসিং সেক্টরে ঋণ ২ শতাংশ বাড়িয়ে করে দিয়েছে ১২ শতাংশ, উল্টোদিকে কৃষিক্ষেত্রে ঋণ ১৬ শতাংশ থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ১১ শতাংশ। তার পরিণতি কি হলো বর্তমান অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর মুখেই শুনুন। তিনি সম্প্রতি ইন্দো-আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্সের এক সভায় বলেছেন, "এ বছরের প্রথম কোয়ার্টারে কৃষিতে বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ২—৫ শতাংশ; দ্বিতীয় কোয়ার্টারে হয়েছে ১ শতাংশেরও কম; আর তৃতীয় কোয়ার্টারে বৃদ্ধি তো নয়ই, বরং তা নিম্নগামী হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।" শরদ পাওয়ারজী কি বলবেন! যেখানে কৃষিপণ্যই নেই সেখানে মানুষ কিনছে বেশী, একথা বলার মানে কী? মানে অবশ্যই আছে তা

(এরপর ৪ পাতায়)

" রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলো হলো দেশের মূল শিল্প (key বা core industry)। এগুলোতে বিদেশী পুঁজি ৫০ শতাংশের উপর হয়ে গেলেই এগুলো বিদেশীদেরই হয়ে যাবে। আর বিদেশী ঋণের জালে আপাদমস্তক জড়িয়ে পড়লে আমাদের সার্বভৌমত্ব বলে কি কিছু থাকবে? পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরাকের আকাশে যেমন আজ অবাধে মার্কিন মারণাস্ত্রবাহী বোমারু বিমান উড়ে বেড়ায় কিংবা তাদের দেশের মাটিতেই বিমান ঘাঁটি বানায়, সনিয়ার নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকারের আমলে আমরাও ক্রমশই সেইদিকেই এগিয়ে চলেছি না কি? "

চীনের আসল রূপ অনেক দেরীতে বুঝেছিলেন জওহরলাল

অরবিন্দ ঘোষ

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী ১৯৫৮ সালে প্রখ্যাত সাংবাদিক জি পার্থসারথীকে চীনে রাজদূত করে পাঠিয়েছিলেন। কেননা তিনি তাঁর বিশ্বস্ত লোক। তাই যাবার আগে তাঁকে দুটো উপদেশ দিয়েছিলেন। এক, চীন সরকারের কোনও কথাকেই বিশ্বাস না করতে। আর দ্বিতীয় হলো চীন থেকে পাঠানো কোনও টেলিগ্রামই যেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন না দেখতে পান। আজ হয়ত কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হবে না, কিন্তু নেহরুজী শ্রী পার্থসারথীকে চীনের আসল রূপটা জানিয়েছিলেন। চীনের বিশ্বাসের অযোগ্য, হিন্দী-চীনি ভাই ভাই কথাটাকে আর ততটা গুরুত্ব না দিতে বলেছিলেন তিনি। আর "পঞ্চ শীল" নিয়ে খুব বেশি মাথা না ঘামাতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এই সমস্ত কথাগুলি প্রয়াত জি পার্থসারথীর পুত্র অশোক পার্থসারথী ২২ জানুয়ারি ২০১০ এর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস কাগজকে জানিয়েছেন। অশোক, যিনি ভারত সরকারের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, তাঁর পিতার ডায়েরী থেকে এই কথাগুলো এইজন্য জনসম্মুখে আনতে চেয়েছেন যাতে ভারতের লোকেরা যেন চীনকে বিশ্বস্ত বলে না ভাবেন। অবশ্য ভারতের জনতা বহুকাল থেকেই জানেন যে চীন নিজেকে কম্যুনিস্ট দেশ বললেও আসলে একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ। যে দেশ তিব্বতকে গ্রাস করে তিব্বতীদের চৈনিক জাতি বলে চিহ্নিত করে, তাদের ধর্ম সংস্কৃতিকে নষ্ট করে। সব তিব্বতীদের কম্যুনিস্ট বলে বিদিত করা'র চেষ্টা করে—১৯৫০ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে, যেদিন মাও জে দং এর সৈন্যরা এই শান্তিপ্রিয় দেশ তিব্বতকে কুক্ষিগত করার ষড়যন্ত্র করেছিল। অশোক পার্থসারথী ধন্যবাদের পাত্র কেননা ঠিক এই সময়েই—জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে—তিব্বতের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী সঙ্গধোম রীনপোচের (Sangdhom Rinpoche) নেতৃত্বে একটি delegation চীনের নেতাদের সাথে আলোচনার জন্য বেজিং পৌঁছেছিল। এটি দুই "সরকারের" (তিব্বতের সরকারকে কিন্তু ভারতসহ কোনও দেশই স্বীকৃতি (recognition) দেয়নি) মধ্যে নবমবার আলোচনা চলছিল। আলোচনার ফলাফল, চীনের নেতারা চান তিব্বতীরা স্বীকার করুক

(এরপর ১৪ পাতায়)

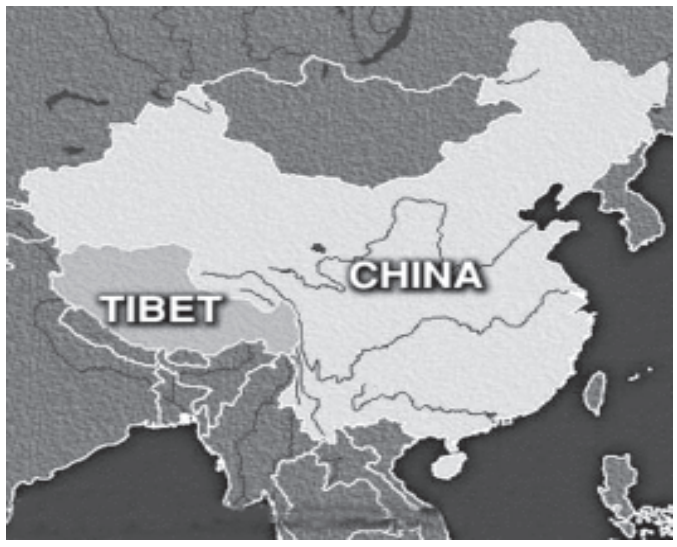

ক্ষুব্ধ হিন্দুরা

(১ পাতার পর)

উপজাতি এবং ৭ শতাংশ ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণ চালু রয়েছে। এরসঙ্গে যুক্ত হলো ১০ শতাংশ ওবিসি-মুসলিম সংরক্ষণ। ইতিমধ্যেই অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট সেরাজ্যের এমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা নাকচ করে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অনড়। সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে পথে নেমেছে বিজেপি। আগামীদিনে আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে বলে দলের তরফে দাবি করা হয়েছে। তবে বিজেপি নয়, হয়তো একাধিক হিন্দু সংগঠন এভাবে মুসলিম তোষণের বিরোধিতা করে আদালতে যাবে। সিপিএমের দ্বিচারী মুখোশ খোলার এটাই সময়। ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ ঘোষণা করেও সিপিএম তাই নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ দাবি করছে, হিন্দুরা সবাই দেখছে।

কংগ্রেসের জেহাদি তোষণ

(১ পাতার পর)

আফজল গুরুকে ফাঁসি দেওয়ার আদেশ নিম্ন আদালত থেকে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট সকলেই দিয়েছিল। ফাঁসি দেওয়ার আদেশ অমান্য করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে যথেষ্ট ভর্ৎসনাও করেছে। কিন্তু তারপরেও মনমোহন সরকারের কোনও হেলদোল নেই।

মুম্বাই, দিল্লি, পুণে সর্বত্র সাধারণ নিরপরাধ মানুষ জেহাদি সন্ত্রাসের শিকার হলেও অপরাধীরা শাস্তি পায়নি। মুম্বাইতে শহরতলীর রেলে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ঘটনায় ধৃত জেহাদিদের বিচারের পর প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। আদালতের আদেশ আজও কার্যকর হয়নি। কলকাতায় মার্কিন তথ্য ভবনের সামনে হামলা চালিয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের খুন করার অপরাধে দণ্ডিতদের ফাঁসির আদেশ কার্যকর করা হয়নি। সত্যি কথা বলতে কী কেন্দ্রে কংগ্রেস জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ইসলামি জেহাদিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়নি। অবাক হওয়ার কিছু নেই যদি দেখা যায় যে ২০০৮-এর নভেম্বরে মুম্বাইতে জেহাদি হামলায় গ্রেফতার কাসভ-এর বিচার বিলম্বিত করার চেষ্টা হচ্ছে। এমনকী তার প্রাণদণ্ড হলেও তা কার্যকর করাতে গড়িমসি করা হচ্ছে।

এমন মুসলিম জেহাদি তোষণ চললে ভারতের কোনও শহরই আর নিরাপদ থাকবে না।

সরকারের অর্থনীতির মতোই দিশাহীন

(৩ পাতার পর)

হলো বিদেশ থেকে কৃষিপণ্য আমদানী করার ধান্দাবাজি। তাতেই হয়ত ওনার লাভ!

একদিকে কৃষিমন্ত্রী কৃষিকে গলা টিপে ধরে আছেন, আর অন্যদিকে বাণিজ্য মন্ত্রী করে চলেছেন একের পর এক দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি। এই চুক্তি দেশের স্বার্থে করা হচ্ছে না; বরং করা হচ্ছে দেশের বাণিজ্যকে ধ্বংস করতে। কারণ এই চুক্তিতে বিদেশী পণ্যের উপর থেকে আমদানী শুল্ক তুলে দেওয়া হয়েছে। অন্য দেশগুলো নিজ নিজ দেশের কৃষিতে যথোচিত পুঁজি বিনিয়োগ করছে;সরকারি নানান সাহায্য দিচ্ছে। ফলে এমনিতে তাদের পণ্যের দাম কম;তার উপর আমরা যদি তাদের পণ্যের উপর থেকে আমদানী শুল্ক তুলে দিই; তাহলে তো আমাদের বাজারে সস্তা বিদেশী পণ্যে ভরে যাবেই। আমাদের শ্বাসরুদ্ধ কৃষি কেমন করে তাদের পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিঁকে থাকতে পারবে?

আগেই বলেছি আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য অত্যন্ত কম। আমদানীই বেশী। সেই কারণে বাণিজ্যিক ঘাটতি বা আর্থিক ঘাটতি চরম। ডিসেম্বর পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী আর্থিক ঘাটতি গত ১৬ বছরের রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে। এই জানুয়ারি থেকে মুক্ত-বাণিজ্য চুক্তিগুলি কার্যকরী হলে আমাদের রাজস্ব ঘাটতি, বাণিজ্য ঘাটতি এবং আর্থিক ঘাটতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলা মুশকিল। কারণ এইসব দেশগুলিতে আমাদের দ্রব্য রপ্তানী হয় অত্যন্ত কম। অর্থাৎ বাণিজ্যিক ভারসাম্য আমাদের পক্ষে নয়।

রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর পরিসংখ্যানবিদ (?) ডুভুরি সুববারাওজী শরদ পাওয়ারের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে বলেছেন, পণ্যমূল্যের দাম বৃদ্ধির কারণ সরবরাহে ঘাটতি। বি.জে.পি'-র এক নেতা দেবব্রত চৌধুরী এই পত্রিকাতেই লিখেছেন, দরবৃদ্ধির কারণ সরকারী কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি। তিনিও নিশ্চয়ই একজন পরিসংখ্যানবিদ! তবে কোথা থেকে তিনি এই তথ্য পেলেন তা জানা নেই। ওনার বোধ হয় স্মরণে নেই যে এর আগের বেতন কমিশনের বেতন বৃদ্ধি ও ৫০ শতাংশ ডি. এ মূল বেতনের সঙ্গে যুক্ত করে আর্থিক সুবিধা দানের মতো ঘটনা তার দলীয় সরকারের আমলেই ঘটেছিল। কই বিজেপি তথা ত্বড্ডট্ট সরকারের আমলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি তো হয়নি।

আসলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, বাণিজ্য ঘাটতি, আর্থিক ঘাটতি, বেকারত্ব প্রভৃতির কারণ লুকিয়ে আছে অন্যত্র, জাতীয় সত্তাহীন, জাত্যাভিমানহীন, বিদেশী চাটুকার একটি দলের সরকারের কাছ থেকে এটাই স্বাভাবিক প্রাপ্তি। তা নাহলে মানুষের টাকার মূল্য যেখানে তলানিতে ঠেকেছে, সংসার চালাতে একজন কর্মরত মানুষই হিমসিম খাচ্ছে। সেখানে ব্যাংকের সুদ কমিয়ে দিয়ে একজন অবসরপ্রাপ্ত মানুষকে কি চরম দুর্দশার মধ্যে সরকার ফেলে দিয়েছে, রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর কী তা অনুভব করতে পারছেন না? অথচ ওনাদের যত আগ্রহ শিল্পপতিদের কোটি কোটি টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়ার; জলের দরে বিদেশী মুদ্রায় ঋণ দেওয়ার; সেভিংস রেট কম রেখে, ব্যবসাদার, প্রমোটারদের কম সুদে ঋণ দেওয়ার। আর্থিক ঘাটতির সুযোগ নিয়ে আবার বিদেশী ঋণ নেওয়ার ধান্দা করছেন অর্থমন্ত্রী;সঙ্গে সঙ্গে এই সুযোগে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো বিক্রি করে দেওয়ারও পরিকল্পনা শুরু করেছেন। এতে নাকি ৩০,০০০ কোটি টাকা আসবে। পিতৃ সম্পত্তি বিক্রি করে ফূর্তি করা যাকে বলে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলো হলো দেশের মূল শিল্প ছন্সন্দ্বম্ভ বা স্তুপ্সভ্জন্দ্ব ন্‌৩স্তুত্ত্বব্দদ্ধভ্জম্ভ)। এগুলোতে বিদেশী পুঁজি ৫০ শতাংশের উপর হয়ে গেলেই এগুলো বিদেশীদেরই হয়ে যাবে। আর বিদেশী ঋণের জালে আপাদমস্তক জড়িয়ে পড়লে আমাদের সার্বভৌমত্ব বলে কি কিছু থাকবে? পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরাকের আকাশে যেমন আজ অবাধে মার্কিন মারণাস্ত্রবাহী বোমারু বিমান উড়ে বেড়ায় কিংবা তাদের দেশের মাটিতেই বিমান ঘাঁটি বানায়, সনিয়ার নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকারের আমলে আমরাও ক্রমশই সেইদিকেই এগিয়ে চলেছি না কি?

রাজ্য রাজনীতি

হয় পার্টি-প্লেনাম, নয় পার্টি-কংগ্রেস
সি পি এম নেতৃত্বের বদল অবশ্যম্ভাবী

নিশাকর সোম

আমাদের এই কলামে সিপিএম-এর নিচের তলার কর্মীদের দাবির কথা—"পার্টির নীতি ও নেতাদের পর্যালোচনা চাই। তাই চাই পার্টি-কংগ্রেস অথবা প্লেনাম।" এই লেখা প্রমাণিত হল। সিপিএম-এর পলিটব্যুরোতে পার্টি-কংগ্রেসের প্রস্তাব ওঠায় পশ্চিমবঙ্গের এবং কেরলের পলিটব্যুরো সদস্যগণ নিজ নিজ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন এবং তার পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত থাকার অজুহাতে পার্টি-কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন। তখন পলিটব্যুরো সিদ্ধান্ত করে যে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় আলোচনা হবে। তবে পার্টির সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যে এই ইঙ্গিত স্পষ্ট ছিল যে কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে পার্টির "উত্থান" অসম্ভব।

পলিটব্যুরোতে আলোচনায় কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য-সম্পাদকদের ব্যর্থতার সমালোচনা সকল সদস্যদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের পলিটব্যুরো সদস্যরা অবশ্য এতে সামিল হননি।

সবথেকে সমালোচনায় মুখর হন ডঃ পান্ধে। তিনি পলিটব্যুরো সভায় এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন। পলিটব্যুরো সদস্য পিল্লাই পলিটব্যুরোর সদস্যদের আত্মসমালোচনা করার প্রশ্নটি তোলেন। সব থেকে চাঞ্চল্যকর ঘটনা হলো—ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তথা পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকারও সমালোচনায় মুখর হন। এ-কথায় বলা যায় যে কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গের পার্টি নেতৃত্ব নিন্দিত-সমালোচিত হয়েছে এবং বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন।

সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় শুদ্ধিকরণ ও পার্টি-কংগ্রেস নিয়ে আলোচনার কথা ওঠে। পলিটব্যুরো এবং পার্টির শীর্ষ নেতাদের চালচলন যথেষ্ট সমালোচনার। পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও পলিটব্যুরোর সদস্য ইয়েচুরির বিদেশ ভ্রমণ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কেরল এবং অন্যান্য রাজ্যের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণ। পার্টি কংগ্রেস পিছিয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় প্লেনাম আগামী আগস্ট মাসে করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, জরুরি অবস্থার পর সিপিএম-এর ছন্নছাড়া অবস্থা হয়। তখন পি. সুন্দরাইয়া সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। সালকিয়া প্লেনামে সুন্দরাইয়ার গ্রাম-শহর-এর সংগ্রামের নীতি বর্জিত হয়ে নির্বাচনই একমাত্র পথ—এই সিদ্ধান্ত হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার অধিকার করার জন্য হিন্দী-বলয়ে পার্টি সংগঠন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু হা হতোস্মি। এখনও তা হয়নি। এবারের প্রস্তাবিত প্লেনামে কংগ্রেসকে সমর্থন এবং বিরোধিতা এই নীতির তুল্যমূল্য বিচার ছাড়াও পার্টি নেতৃত্বের সমালোচনামূলক-ক্রিটিক্যাল রিপোর্ট পেশ করা হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক বিষয়ে তীব্র সমালোচনার ঝড় ওঠে। কংগ্রেসকে সমর্থন এবং বিরোধিতা—এই নিয়ে তীব্র বিতর্ক হয়েছে। শেষমেশ সিদ্ধান্ত হয়—রাজনৈতিক-সাংগঠনিক প্রস্তাব নিয়ে জুলাই মাসে আলোচনা হবে। তারপর আগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় প্লেনামে (বর্ধিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভা) রাজ্যের প্রতিনিধি ঠিক করবে রাজ্য কমিটি। এখানেও নেতৃত্বের পক্ষের লোকেরাই স্থান পাবেন।

একথা এখনই বলা যায় যে, এবারের প্লেনামেও নীতি এবং নেতৃত্বের পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

পলিটব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সভার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-কমিটি এবং রাজ্যের বর্ধিত রাজ্য-কমিটির সভা হয়। রাজ্য-কমিটিতে শুদ্ধিকরণ নিয়ে মামুলি আলোচনা হয়। জোর দেওয়া হয়েছে পার্টি-কর্মীদের সক্রিয় করার উপর। এ-কথা বলে দেওয়া যায়—পার্টির নিচের তলার কর্মীদের নিস্ক্রিয়তার মূল কারণগুলি হল—(১) ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া-কর্মীরা ক্ষমতার দিকেই দৌড়াচ্ছেন। (২) নীতি ভিত্তিক কর্মীদল ছিল না—নেতা ভিত্তিক কর্মীদল। নেতার উপর আস্থা চলে যাওয়ার ফলেই নিস্ক্রিয়তা। (৩) কিছু কর্মী নিজেদের অন্যায়-আচরণের পাল্টা মারের ভয়ে পার্টি ত্যাগ করছেন অথবা নিষ্ক্রিয় হচ্ছেন। ওই অংশ আর কোনওদিনও পার্টি করবেন না। পার্টির নেতারা নিচের তলার পার্টিকর্মীদের ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য কোনওদিনই রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেনি। ফলে ক্ষমতালোভী নিচের তলার কর্মীরা ক্ষমতার লোভে বিরোধী জোটে এখনই অনুপ্রবেশ করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন।

> **"পার্টির নিচের তলার কর্মীদের নিস্ক্রিয়তার মূল কারণগুলি হল—(১) ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া-কর্মীরা ক্ষমতার দিকেই দৌড়াচ্ছেন। (২) নীতি ভিত্তিক কর্মীদল ছিল না—নেতা ভিত্তিক কর্মীদল। নেতার উপর আস্থা চলে যাওয়ার ফলেই নিস্ক্রিয়তা। (৩) কিছু কর্মী নিজেদের অন্যায়-আচরণের পাল্টা মারের ভয়ে পার্টি ত্যাগ করছেন অথবা নিষ্ক্রিয় হচ্ছেন।"**

সিপিএম-এর বর্ধিত রাজ্য-কমিটির সভায় রাজ্য-কমিটির সুপারিশ মতোন পাঁচজনকে রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীতে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে বিমান বসুর পক্ষে রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীতে শক্তির বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। তবে একথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে এই নতুনরা বিমান বসুকে সর্বতোভাবে সমর্থন করবেন। বিশেষত পশ্চিম মেদিনীপুরের নেতা দীপক সরকার নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হবেনই। হাওড়া থেকে শ্রীদীপ ভট্টাচার্য অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থ হল হাওড়ার ব্যর্থ নেতা দীপক দাশগুপ্তকে "কাট টু সাইজ" করা। দীপক দাশগুপ্ত, মৃদুল দেব—এদের রাজ শেষ হবেই। এঁদের বিরুদ্ধে পূর্ব মেদিনীপুর এবং নদীয়া জেলায় দলাদলির অভিযোগ আছে।

আসন্ন পুর-নির্বাচন নিয়ে সিপিএম-এর রাজ্য-নেতৃত্বের নাজেহাল অবস্থা। কোনও জেলাতেই অভিযোগ-বিহীন কর্মী পাওয়া যাচ্ছেনা—যাঁদের সামনে রেখে পুর-নির্বাচন করার প্রস্তুতি করা যায়। পচা শামুকে পা-কাটলে গ্যাংগ্রিন হবেই। আর গ্যাংগ্রিন অস্ত্রোপচার না করলে সমগ্র দেহে পচন ধরে।

রাজ্য সিপিএম-নেতৃত্বকে পলিটব্যুরো, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং বর্ধিত রাজ্য-কমিটির সভায় সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশেষ করে বিমান-বুদ্ধ-নিরুপম-বিনয় কোঙার-কে তুলোধনা করেছেন বিভিন্ন নেতা। সব থেকে বেশি সমালোচনা করেছেন—দীপক সরকার, বিপ্লব মজুমদার, সুধীর ব্যানার্জি, কলকাতার দিলীপ সেন, কল্লোল মজুমদার এবং অমিতাভ নন্দী-তড়িৎ তোপদার। এঁদের বক্তব্য হল—সমগ্র নেতৃত্ব বদল কর—নীতির পর্যালোচনা করে নীতি বদল কর।

পুর-নির্বাচনে সিপিএম-এর ফল খারাপ হবে। বামফ্রন্টের মধ্যে এখন ফরওয়ার্ড ব্লক

(এরপর ৬ পাতায়)

অ রকম

'সব পেয়েছির দেশে'

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গুজরাতের ভদোদরা জেলায় সংরক্ষিত বন এলাকার কয়েকটি জায়গার নাম এরকম—ডাববা, খোখরা, ওয়াদিয়া, আমতা, উমজেত, নিসানা, মাতহা, জুলতানি, বুদ্ধ জুলতানি, হারখোল, খেন্দা তালাভ, কুপ্পা, গানিয়ের বাড়ি। এই সমস্ত গ্রামগুলিতে একদা থমকে ছিল জীবন, সূর্যোদয়ের রবিকিরণে যাদের নিদ্রা ভাঙ্গত, আর সূর্যাস্তে সাঁঝের বাতি নিভিয়ে তাদেরই চোখে নেমে আসত ঘুম। দিনগত পাপক্ষয়টুকু বাদ দিলে জীবনের আর কিইবা অস্তিত্ব ছিল সেখানে? জিজ্ঞাসা করুন সেই 'নেই রাজ্যের বাসিন্দা' ভদোদরা জেলার নাসুদ তালুকের বাসিন্দাদের।

নেই তো মোটে একটা জিনিস। সেটা ছিল বিদ্যুৎ। আর তাতেই যেন অচল হয়ে পড়েছিল গোটা জীবন। বিদ্যুৎ-এর জন্য পাম্পে করে জল তুলে কৃষিকাজে লাগানো যাচ্ছে না। কখনও আবার স্তব্ধ হয়ে পড়ছে হাসপাতালের চিকিৎসা-ব্যবস্থা। সুতরাং কৃষকের সর্বনাশ বা অসহায় রোগীর মৃত্যু কোনওটাই ব্যতিক্রমী ঘটনা ছিল না সেখানে। এভাবে বাঁচা যায়? জিজ্ঞাসা করুন 'বিদ্যুৎ-পৃষ্ঠ' ভদোদরা জেলার নাসুদ তালুকের বাসিন্দাদের।

সংরক্ষিত বন এলাকা বলে কথা। প্রকৃতিটাকে তো আগে বাঁচাতে হবে। তাই নির্মাণের কাজ সেখানে একেবারেই নৈব নৈব চ। কিন্তু 'প্রকৃতি' বাঁচাতে গিয়ে তো মানুষগুলোই মরতে চলেছে! তাঁদের বাঁচানোর কোনও ব্যবস্থাই কি করছে না 'উন্নয়নের মুখ' নরেন্দ্র মোদীর গুজরাত সরকার। জিজ্ঞাসা করুন 'প্রকৃতি-সচেতন' ভদোদরা জেলার নাসুদ তালুকের বাসিন্দাদের।

জীবন যখন থমকে ছিল— হস্তচালিত যন্ত্রের দিন শেষ। এসেছে বিদ্যুৎ।

রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজই যখন বন্ধ তখন সেদেশে বিদ্যুৎ পৌঁছোবে কি করে? সেই জন্য গুজরাত সরকার কয়েক মাস আগে ওই এলাকায় প্রথম রাস্তাটি স্থাপনের বন্দোবস্ত করলেন। গড়ে উঠল কুচ্চা রোড। একদম শুরুর দিকে রাস্তাটি বর্ষায় কর্দমাক্ত হয়ে পড়ত। স্থানীয় বাসিন্দারা সরকারের পূর্ত বিভাগকে যথাযথ সহযোগিতার পর রাস্তাটি এখন বেশ পাকা-পোক্ত হয়ে উঠেছে। এটা কি সরকারের প্রতি সহানুভূতি নাকি স্বাধীনতার দীর্ঘ ছ'দশক পর একটু 'বাঁচার চেষ্টা' করা? জিজ্ঞাসা করুন 'দায়িত্বশীল' ভদোদরা জেলার নাসুদ তালুকের বাসিন্দাদের।

রাস্তা যখন তৈরিই হলো, বিদ্যুৎ পৌঁছোতেও বেশি দেরি হবার কথা নয় সেখানে। অতএব বিদ্যুৎ পৌঁছোল। সারা বিশ্বের সাথে সম্পর্করহিত অবস্থাটা ক্রমশ কেটে যেতে লাগল। রোগীর মৃত্যু কিংবা কৃষকের হা-হুতাশ অবলুপ্ত হয়ে গেল। সেখানকার মানুষরা বলছেন—"যদি ঠিক সময়ে বর্ষা না আসে, তখন খাবার না পেয়ে আমরা বাঁচব কিভাবে? বিদ্যুতায়ন আমাদের জীবনটাই পাল্টে দিয়েছে।" সত্যিই তাই? জিজ্ঞাসা করুন 'সব পেয়েছির দেশে' পৌঁছে যাওয়া ভদোদরা জেলার নাসুদ তালুকের বাসিন্দাদের।

স্থানীয় বাসিন্দা ওয়াদিয়া গ্রামের ডান্ডিয়া দুংগ্রাভিল বিদ্যুতায়নের ব্যাপারটাকে এভাবে দেখছেন—'এটা আমাদের কাছে ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ'। ভগবানটা কে? গুজরাত সরকার নাকি? জিজ্ঞাসা করুন 'আস্তিক' ভদোদরা জেলার নাসুদ তালুকের বাসিন্দাদের।

জনজাতিরাই মিশনারীদের ষড়যন্ত্র বানচাল করল

সংবাদদাতা ঃ আলিপুরদুয়ার ॥ ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগান ও বনবস্তিগুলো বিদেশী মিশনারীদের টার্গেট পয়েন্ট। এইসব এলাকার সহজ, সরল মানুষদের ধর্মান্তর করা খুবই সহজ। আর্থিক দুরবস্থার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ডুয়ার্সের বনবস্তি ও চা বাগানে বসবাসকারী বিভিন্ন জনজাতি ও উপজাতিদের বহুকাল ধরে খৃস্ট ধর্মে ধর্মান্তরকরণের খেলা খেলে আসছে মিশনারীরা। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষেরা আজ শিক্ষিত হচ্ছে। ই-মেল, মোবাইল, ইন্টারনেটের ছোঁয়া পেয়েছে তারা। প্রতিবাদ করতে শিখেছে। ফলে তাদের ধর্মান্তরিত করা আজ কঠিন হয়ে পড়েছে মিশনারীদের পক্ষে। বাধ্য হয়ে মিশনারীরা তাদের স্ট্রাটেজি পরিবর্তন করছে। এমনই ধর্মান্তরকরণ করতে গিয়ে খৃস্টান ধর্ম প্রচারকদের পালাতে হয়েছে গ্রাম থেকে। ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লকের শালকুমার ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের শালকুমারহাট বনবস্তিতে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানান, বাইরে থেকে ২০ জনের একটি খৃস্টান ধর্ম প্রচারকের দল শালকুমারাহাট বনবস্তিতে যায়। সেখানে তারা গান-বাজনা করবে বলে জানায়। স্থানীয় বনবস্তির লোকেদের আমন্ত্রণ জানায় তারা। প্রথমে আর্থিক (মোটা অঙ্কের টাকা) প্রলোভন দেখান হয়। তাতেও কাজ না হলে বনবস্তিবাসীদের শারীরিক নির্যাতনের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে খৃস্টধর্ম গ্রহণ না করলে শারীরিক ভাবে নির্যাতনের হুমকিকে কেন্দ্র করে খৃস্টান ধর্ম প্রচারকদের সাথে স্থানীয় বনবস্তিবাসীদের বচসা বাধে। উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকে। শেষপর্যন্ত খৃস্টধর্ম প্রচারকরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লকের শালকুমার ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের শালকুমারহাট বনবস্তিটি দক্ষিণ জলদাপাড়া বনাঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে বাস করেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী ৬৭ পরিবারের ৩৮০ জন রাভা সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। হিন্দু ধর্মাবলম্বী এইসব রাভা পরিবারকে খৃস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করতে চাইছে বহিরাগত কিছু খৃস্টধর্ম প্রচারক। মন্টু রাভা নামে এক ছাত্র জানান, কাউকে জোর করে ভয় দেখিয়ে নতুন ধর্ম (খ্রীস্টধর্ম) গ্রহণ করানোটা আইন বিরুদ্ধ কাজ। আমরা সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী। তাই আমরা গ্রামবাসীরা এর বিরোধিতা করেছি। বিষয়টি আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লকের বিডিও, ডিএফও, আলিপুরদুয়ার অভিভাবক মঞ্চ সহ অনেক দপ্তরে লিখিতভাবে জানিয়েছি। রাভাদের পক্ষে কেদার রাভা, বিমল রাভারা বলেন, লতাবাড়ি, বোম্বে থেকে একদল খৃস্টধর্ম প্রচারক আমাদেরকে জোর করে ভয় দেখিয়ে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। তা মেনে নেওয়া যায় না। এদিকে ধর্মান্তরকরণকে ইস্যু করেছে বেশ কয়েকটি সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন। পিছিয়ে নেই বিজেপি। মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে খৃস্টধর্ম প্রচারের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে আর এস এস, ভি এইচ পি-র মতো সংগঠন। আর এস এস-এর আলিপুরদুয়ার সাংগঠনিক জেলার জেলা প্রচারক সন্দীপ সামন্ত বলেন, জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করানো আইনত দণ্ডনীয়। দোষীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক প্রশাসন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আলিপুরদুয়ার সংগঠন সম্পাদক প্রদীপ থাপা বলেন, বিভিন্ন চা বাগান ও বনবস্তির সহজ, সরল মানুষদের নানা রকম প্রলোভন দিয়ে ধর্মান্তরিত করছিল খৃস্টধর্ম প্রচারকরা। শালকুমারহাটের ঘটনায় শারীরিক নির্যাতনের যে পদ্ধতি ধর্ম প্রচারকেরা ব্যবহার করেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লকের বিডিও প্রদীপ্ত ভক্তকে এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, ধর্ম প্রচারকদের ভীতি প্রদর্শনের পর শুনেছি বনবস্তিবাসীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। বিষয়টি তদন্ত করো প্রয়োজনীয়। আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শুধু শালকুমারহাট নয়, ডুয়ার্সের কোহিনূর, রামঝোরা, মহাকালগুড়ি, কুমারগ্রামদুয়ারসহ একাধিক চা বাগান ও বনবস্তির সিংহভাগ মানুষই খৃস্টান মতাবলম্বী হয়ে পড়েছেন। দারিদ্র্যের সুযোগে বিভিন্ন মিশনারী সংস্থা বিভিন্ন চা বাগানের জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে ধর্মান্তরকরণের থাবায় গ্রাস করতে চাইছে। সঞ্জয় রাভা, সুজিত কেরকেট্টার মতো যুবকের সাহসই পারে ধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। রুখে দাঁড়াতে তাদের পাশে থাকবে তো সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনগুলি?— সেই প্রশ্নই থেকে যাচ্ছে তাদের মনে।

আলফা'রা এখনও সক্রিয় অসমে

সংবাদদাতা ॥ আলফা'র কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতা জেলে থাকলেও শান্তিবার্তা বিরোধী পরেশ বরুয়ার অনুগামী জঙ্গিরা এখনও অসমে সক্রিয়। সম্প্রতি তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

নিরাপত্তা বাহিনী তিনসুকিয়া এবং জোড়হাট থেকে প্রচুর বিস্ফোরকসহ পাঁচ আলফা জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা অসমে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের জন্য বৃহৎ ছক করেছিল। কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতায় জঙ্গিদের এই পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। নিরাপত্তা বাহিনী একশ কেজি শক্তিশালী প্লাস্টিক বিস্ফোরক নিওজেল-৯০ উদ্ধার করেছে। পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন তারা এবং সেনাবাহিনী যৌথ অভিযান চালিয়ে তিনসুকিয়া থেকে তিন আলফা জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে এবং পৃথক অভিযান চালিয়ে একই দলের আরও দুই জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে জোরহাট থেকে। ধৃত একজন পদস্থ পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন ধৃত এই পাঁচ আলফা জঙ্গি সম্প্রতি মায়ানমারের শিবির থেকে অসমে লুকিয়ে প্রবেশ করেছে। অসমে হামলা চালানোই তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। নিরাপত্তা বাহিনী ধৃত জঙ্গিদের কাছ থেকে কিছু অস্ত্র এবং বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত করেছে। মায়ানমার থেকে আরও জঙ্গি এখানে লুকিয়ে এসেছে কিনা তা তদন্ত করা হচ্ছে। লখিমপুর থেকে পুলিশ এবং সি আর পি এফ যৌথ বাহিনী নিয়ম মাফিক রোড চেকিং'র সময় একশ কেজি নিওজেল-৯০ বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে। শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থ একটি বেসরকারী যানে লুকানো একটি প্যাকেটে ছিল। সেখান থেকেই নিরাপত্তা বাহিনী উদ্ধার করে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সি আর পি এফ আধিকারিক জানান— নিওজেল-৯০ ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে অন্তত-পক্ষে এক হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটবে।

ত্রিপুরা থেকে গরু পাচার হচ্ছে বাংলাদেশের

সংবাদদাতা॥ ত্রিপুরার ধর্মনগর সীমান্ত পথ দিয়ে সম্প্রতি গরু পাচারকারীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। পাচারকারীরা প্রতিদিন বহু গরু সীমান্ত পথ দিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। সীমান্ত পথগুলির মধ্যে ইয়াকুবনগর, কুর্তি, বিষ্ণুপুর সহ বেশ কিছু স্থান দিয়ে এইসব গরু পাচার অব্যাহত রয়েছে। পাচারকারীরা সারাদিন গরুগুলি গ্রামের এক জায়গায় একত্রিত করে। সন্ধ্যার পর বা ভোরের দিকে গরুগুলি বাংলাদেশে নিয়ে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কিছু অসাধু জওয়ানের সঙ্গে যোগসাজশ থাকার অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগ যে, টাকার বিনিময়ে প্রতিদিন ছাড় দেওয়া হচ্ছে। যার জন্য শহরে এবং গ্রামগুলিতে গরু চুরির প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সম্প্রতি গোরু পাচারের পাশাপাশি বাইক চুরির ঘটনা বেড়েছে। সাত-আটদিন আগে এক বাইক চোরকে আটক করেছিল পুলিশ। ধর্মনগর নতুনবাজার এলাকা থেকে আব্দুল কায়েস নামে এক বাইক চোরকে আটক করে পুলিশ। তার বাড়ি কালাছড়া এলাকায়। সেই বাইক চোর পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি দেয় যে সীমান্ত পথ দিয়ে চুরি করা বাইক দুটি বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। এক্ষেত্রে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দুই জওয়ান সীমান্তপথ অতিক্রম করতে সাহায্য করে। এই ক্ষেত্র থেকে অভিযোগের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। যার জন্য গরু পাচারে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অসাধু কর্মীদের অভিযোগের কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পাচার রোধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সীমান্ত গ্রামের সাধারণ মানুষ দাবী জানিয়েছেন।

অসমে রাজ্যসভার দুটি আসনে বারোজন প্রার্থী

সংবাদদাতা ॥ সিলভিয়াস কন্ডোপান ও আনোয়ারা তাইমুরের বিকল্প কে হবেন? না-কি দু'জনেই ফের অসম থেকে রাজ্যসভায় প্রার্থী হচ্ছেন? শাসকদল কংগ্রেসে এই প্রশ্নের জবাব মেলার আগেই টিকিটের দাবিদারের তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে। অন্তত এক ডজন কংগ্রেস নেতা রাজ্যসভায় প্রার্থী হওয়ার ইঁদুর দৌড়ে নেমেছেন। টিকিটের ইঁদুর দৌড়ে পিছিয়ে নেই প্রধান বিরোধী দল অগপও।

চন্দ্রমোহন পাটোয়ারির দলেও রাজ্যসভা টিকিটের দাবিদার হয়ে ওঠেছেন অন্তত সাতজন নেতা। রাজ্যসভার ফাঁকা দুটি আসনে নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়ার আগেই টিকিটের দাবীতে রীতিমতো প্রতিযোগিতা লেগে গেছে শাসক-বিরোধী দলে। ভোটের বিজ্ঞপ্তি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জারি হয়নি, কিন্তু টিকিট প্রত্যাশীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। অগপ, কংগ্রেস—কোনও দলই অবশ্য কাকে প্রার্থী করা হচ্ছে, এ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেনি। এমনকী প্রার্থী বাছাইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াও শুরু হয়নি। কিন্তু এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে জোরদার লবিবাজী। কংগ্রেসে রাজ্যসভা টিকিটের প্রত্যাশীদের মধ্যে দুই সাংসদের নামও রয়েছে। যাঁদের কার্যকাল শেষ হচ্ছে সেই সিলভিয়াস কন্ডোপান ও আনোয়ারা তাইমুরও ফের রাজ্যসভায় যেতে ইচ্ছুক। এছাড়া প্রাক্তন সাংসদ দ্বিজেন শর্মা, কিরিপ চলিহা, আব্দুল হামিদ, বলিন কুলি, প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা ডঃ হরেন দাস, ববিতা শর্মা, পঙ্কজ বরা, মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা দেবকুমার বরা টিকিটের দাবিদারদের মধ্যে রয়েছেন। বরাক উপত্যকা থেকে রাজ্যসভার দৌড়ে রয়েছেন হেভিওয়েট নেতা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব। তাঁর সঙ্গে টিকিটের লড়াইয়ে রয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রদীপ দত্তরায় ও 'দৈনিক যুগশঙ্খ'র এগজিকিটিভ ডিরেক্টর নীলোৎপল চৌধুরী। অগপ-তেও টিকিটের লড়াই ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। তাই শীর্ষ নেতৃত্বের সামনে সমস্যা বাড়বে। গত নির্বাচনে বীরেন্দ্রপ্রসাদ বৈশ্য যখন সাংসদ ছিলেন, তখন যাঁরা দাবিদার ছিলেন, তাঁরা এবারও টিকিট চাইছেন।

প্রধান বিরোধী দলে রাজ্যসভা টিকিটের মূল দাবিদার হচ্ছেন প্রাক্তন মন্ত্রী হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী, থানেশ্বর বড়ো, দুর্গাদাস বড়ো, প্রাক্তন সাংসদ সর্বানন্দ সনোয়াল, অতুল বরা, হিরণ্য কোঁয়র ও অপূর্ব ভট্টাচার্য। প্রত্যেকেই টিকিটের দাবিতে জোরদার লবিবাজী চালিয়ে যাচ্ছেন বলে দলে খবর রয়েছে।

বদল অবশ্যম্ভাবী

(৫ পাতার পর)

নেতা অশোক ঘোষ আর সিপিআই নেতা মঞ্জুকুমার মজুমদার বিমানবাবুকে সাহায্য করেন। আর এস পি যথারীতি সিপিএম-এর বিরুদ্ধে তোপ দেগে চলেছে।

বলে রাখা ভাল কলকাতার প্রজেক্টেড মেয়র হিসাবে যদি সুধাংশু শীলকে না-রাখা হয় তবে সমগ্র উত্তর কলকাতায় পার্টি বসে যাবে।

‘আহূতি দিবস’ পালন কাশ্মীরি পণ্ডিতদের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ঠিক দু’দশক আগের কথা। সালটা ১৯৯০। তারিখ ১৯ জানুয়ারি। কাশ্মীরি পণ্ডিতরা বাধ্য হলেন যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করতে। যে ট্র্যাজিক পরিণতির ছাপ আজও বহন করে চলছেন তাঁরা। এবার বেদনা-বিধুর চিত্তে প্রকৃতির নির্মম পরিহাসকে (যে পরিহাসের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মদতদাতা মহামান্য (!) ভারত সরকার) স্মরণ করে গত ১৯ জানুয়ারি ‘আহূতি দিবস’ পালন করলেন পণ্ডিতরা। পণ্ডিতদের বিভিন্ন সংগঠন যেমন পানুন কাশ্মীর, অল স্টেট কাশ্মীর পণ্ডিত কনফারেন্স (এ এস কে পি সি), জম্মু ও কাশ্মীর বিচার মঞ্চ (জে কে ভি এম), নন-ক্যাম্প কো-অর্ডিনেশন কমিটি, এ পি এম সি সি ও উদ্বাস্তু শিবিরের প্রতিনিধিরা মিলে রাজ্যের রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসেন। সন্ত্রাসবিরোধী, পাক-বিরোধী ও সরকার-বিরোধী স্লোগানে রীতিমতো সরগরম ছিল ধর্নামঞ্চ।

তবে এঁদের প্রতিবাদকে আরও উদ্বুদ্ধ করেছেন কংগ্রেসের মুখপাত্র মনীষ তেওয়ারি। একটি বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলেছেন মনীষ আর আলটপকা মন্তব্য করে বসেছেন—‘উপত্যকা থেকে নিজেদের বিতাড়নের জন্য দায়ী স্বয়ং কাশ্মীরি পণ্ডিতরাই। তৎকালীন রাজ্যপাল জগমোহনের ভয়েই তাঁরা উপত্যকাচ্যুত হয়েছিলেন, সন্ত্রাসবাদের কারণে নয়।’ এহেন মন্তব্যে বেজায় রুষ্ট হন কাশ্মীরি পণ্ডিতরা।

সংযুক্ত কাশ্মীরি পণ্ডিত কাউন্সিলের পক্ষ থেকে গত ২৫ জানুয়ারি এনিয়ে জম্মুতে একটি বিক্ষোভ প্রদর্শনীরও আয়োজন করেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীরা মনীষ তেওয়ারীর ওপর তাঁদের ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন—‘আসলে তিনি প্রকৃত সত্যটাকেই আড়াল করতে চেয়েছেন। আজ থেকে বিশ বছর আগে সন্ত্রাসবাদীরা হাজার হাজার কাশ্মীরি পণ্ডিতকে

বিক্ষোভরত কাশ্মীরী পণ্ডি তরা।

হত্যা করেছিল এবং বাধ্য করেছিল তাদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে।’ যার জাজ্বল্যমান প্রমাণ আজকের দিনেও একইভাবে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে খুন হচ্ছেন নিরীহ কাশ্মীরি পণ্ডিতরা। আর মনীষের কথার অসত্যতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ রাজ্যপাল হিসেবে জগমোহনের মেয়াদকাল। পণ্ডিত-নিধন শুরু হয় ১৯৮৯ সালের আগস্টে। তাঁরা উপত্যকা ছেড়ে পালাতে থাকেন ওই বছরেরই অক্টোবর-নভেম্বরে। অথচ এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৯০ সালের ১৭ জানুয়ারি রাজ্যপাল হয়ে আসেন জগমোহন। এমনকী জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা পর্যন্ত স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন যে নিরাপত্তাই পণ্ডিত-উচ্ছেদের একমাত্র কারণ।

তবে নিজের কথার ফাঁদে নিজেই জড়িয়ে মনীষ এখন পুরো কাশ্মীর-পণ্ডিত সমাজেরই তোপের মুখে। সারা রাজ্য কাশ্মীরি পণ্ডিত কনফারেন্সের পক্ষে এইচ এল চাড্ডা বলেছেন, ‘বছরের পর বছর ধরে কোনও কায়েমী স্বার্থের কারণে জগমোহনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে এটা পুরোপুরি ভ্রান্ত ও যুক্তিহীন দোষারোপ।’ পণ্ডিতদের অপর একটি সংগঠন পানুন কাশ্মীরের চেয়ারম্যান ডঃ অজয় চাংগ্রু বলেছেন—“তেওয়ারির বোঝা উচিত ১৯৯০-এ ৩ লাখ ৫০ হাজার নরনারীকে উপত্যকা থেকে বিতাড়ন আসলে দীর্ঘমেয়াদী একটি পরিকল্পনারই ফসল। ইতিমধ্যে পণ্ডিতরা যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। আর তার মধ্যেই নারী শিশু সহ সাড়ে চারশোর মতন কাশ্মীরি পণ্ডিতরা খুন হয়েছেন সন্ত্রাসবাদীদের হাতে।”

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালের ২০ জানুয়ারি কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ইতিহাসে চিরদিনই একটা ‘কালো দিন’ হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ পাক-জিহাদী মদতপুষ্ট জঙ্গিরা কাশ্মীর উপত্যকা ত্যাগ করার জন্য চরম হুঁশিয়ারি দেয় পণ্ডিতদের। এবং ‘অবাধ্য’দের ওপর নৃশংস তাণ্ডবলীলা চালায়। যে কারণে এইচ এল চাড্ডা বলতে বাধ্য হয়েছেন—পণ্ডিতরা ১৯৮৯-৯০-এ তাদের কাশ্মীর উপত্যকা থেকে বিতাড়ন ও পরবর্তীকালে সরকারি মদতে অত্যাচারের ঘটনা কোনওদিনই ভবিষ্যতে ভুলতে পারবে না।”

গো-হত্যা ‘অপরাধ’ কর্ণাটকে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল নির্বাচনী ইস্তাহারেই। এবং সেই ‘নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি’র অঙ্গীকার এবার রাখল কর্ণাটকের বিজেপি সরকার। সে রাজ্যে নিষিদ্ধ হতে চলেছে গো-হত্যা।

গত ১০ই ফেব্রুয়ারি কর্ণাটকের রাজ্য মন্ত্রিসভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে বিধানসভার আগামী অধিবেশনে একটি বিল আনা হবে যাতে গো-হত্যা ‘গুরুতর অপরাধ’ হিসেবেই চিহ্নিত হবে। সরকারি সূত্র বলছে—এ ব্যাপারে ‘শাস্তি’র বন্দোবস্ত থাকছে বিলটিতে। কারাবন্দি থেকে শুরু করে আর্থিক জরিমানা-অপরাধের গুরুত্ব বিচার করে নিরূপিত হবে শাস্তির পরিমাণ।

এ নিয়ে কর্ণাটকের গৃহমন্ত্রী ডা. ভি এস আচার্য মন্তব্য—“এই বিলে আমরা চাইছি ১৯৬৪-এর গো-হত্যা ও গো-সংরক্ষণ আইনকে পরিবর্তন করে নতুন আইন প্রণয়ন করতে। ভারতীয় সংবিধানের ৪৮নং ধারা থেকে সংশ্লিষ্ট আইনটি কখনই বিচ্যুত হবে না। বরং এই নতুন বিলটি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের যেমন জম্মু-কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাত ও মধ্যপ্রদেশের বর্তমান আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।”

কিন্তু এই বিষয়টাকে ইতিমধ্যেই ভোটের ময়দানে টেনে এনে নামিয়েছে কংগ্রেস। তারা পুরো বিষয়টার মধ্যেই ‘সঙ্ঘ পরিবারের’ গন্ধ পাচ্ছে। কিন্তু প্রকারান্তরে এটাও স্বীকার করে নিচ্ছে যে—এই নতুন বিল অকার্যকরী করার ক্ষমতা তাদের নেই। কারণ প্রথমত, বিধানসভায় কংগ্রেসের প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতাই নেই। আর দ্বিতীয়ত, এনিয়ে জনরোষের ভয়টাই কংগ্রেস পাচ্ছে সবচেয়ে বেশি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আর ভি দেশপাণ্ডের বক্তব্য—‘‘ইয়েদুরাপ্পার নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার আসলে সঙ্ঘপরিবারের অ্যাজেণ্ডারই প্রতিফলন ঘটাতে চাইছে। যদিও আমরা এই বিলের বিরুদ্ধে এখনই সরব হচ্ছি কিন্তু এটাও জানি যে কোনও মূল্যে বিধানসভায় আমাদের হারিয়ে দেবে সরকার।”

সম্প্রতি গোমাংস বিক্রেতারা (যারা সকলেই মুসলমান) সরকার যাতে এহেন

মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পা

বিল বিধানসভায় না আনেন সে বিষয়ে বিস্তর চেষ্টা চরিত্র করেছিলেন। এমনকী এই বিল আনার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার পরও তারা বেশ বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যের মানুষ গো-হত্যা বন্ধ না হওয়ায় ক্রমশ ক্ষেপে উঠছে বুঝে তারা পিছু হটে যান। কিন্তু ‘সুদূরপ্রসারী ভোটব্যাঙ্ক’-এর স্বার্থে এই ব্যাপারে কংগ্রেস এখন বেশ সরব।

যাইহোক, ভি এস আচার্য, আইনমন্ত্রী সুরেশ কুমার এবং বন ও পশুপালন মন্ত্রী রেভু নায়েক বেলামাগি-কে নিয়ে গঠিত তিন সদস্যের সাব-কমিটি গো-হত্যা বন্ধে যেমন তথ্যনিষ্ঠ যুক্তি সাজিয়ে আইন প্রণয়নে সচেষ্ট হবেন, তেমন গো-সংরক্ষণেও তাঁরা উদ্যোগী হবেন বলে সংবাদ-সূত্রের খবর।

প্রস্তাবিত বিল অনুসারে, গো-হত্যাকারী এবং গো-মাংস বহনকারীদের অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে ১-৭ বছর পর্যন্ত জেল এবং ২৫,০০০ থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা অনাদায়ে দুটোই হতে পারে। তবে প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে ‘শাস্তি’ কিছুটা হলেও ‘লঘু’ হবে।

রাজ্যে প্রথমবারের জন্য ক্ষমতায় আসা ইস্তক সরকারি প্রচেষ্টা ছিলই গো-হত্যা বন্ধে। সেই উদ্দেশ্য বোধহয় এতদিনে সফল হতে চলল। শত বিরোধী বাধা সত্ত্বেও।

শান্তিনিকেতনে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (ফাইল চিত্র)

শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসব

শ্রীকৃষ্ণগোপাল রায়

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ,—উদার উন্মুক্ত দিগন্ত বিস্তৃত গৈরিক শুষ্ক রুক্ষ প্রান্তরের উপর দুটি সপ্তপর্ণী ছাতিমগাছের নীচে, তার ধ্যানের যে যোগাসন বেদী প্রতিষ্ঠা করেন,—সেই বেদীতে ধ্যানমগ্ন চোখে দেখেছিলেন দিনান্ত বেলার কিরণচ্ছটায় যে সপ্তাশ্বরথে সাতরঙের রামধনু এঁকে, নীল-নীলিমায় তাঁর সূর্য্য তোরণে আপন কক্ষে চলে যাবে সূর্য্যদেব। দিয়ে যাবে স্বর্ণালী সুন্দর সন্ধ্যার গোধূলীর গৈরিক স্নিগ্ধ কাঞ্চ নম্লান ছায়াময় রূপালী কিরণ। ছাতিমগাছের শুচিস্নিগ্ধ পবিত্র পল্লবে খেলে যাবে ষড় ঋতুর আপন বৈভব। ধ্যানমগ্ন মহর্ষির মহামহিময় তৃতীয় নয়নে তিনি দেখেছিলেন প্রকৃতির এই স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্য।

মহর্ষি এই জনহীন প্রান্তরের উদাস বিরহিনী মাটির কাতর তৃষিত নয়নের ব্যাকুল কামনায় রোপন করালেন হরিকে দিয়ে আমলকী, বকুল, শাল পিয়াল বট অশ্বত্থ কদম বেল ইত্যাদি নানাধরনের গাছগাছালি।

মহর্ষির এই তপোবনের নির্জন পরিবেশে মহর্ষির কনিষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথ—দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরের মাঝে প্রকৃতিমাকে মায়ের ডাকে ব্যাকুলভাবে আকুল হয়ে ওই-সব ছায়াতরু পত্র পুষ্প শোভিত-লতাবিতানের সাথে চুপিসারে মিতালী করেছেন—নব নব রূপে,—প্রতি ঋতুতেই নবারুণ আলোকে বাতাসের আবীর খেলাতে মেতে উঠে রূপায়িত করলেন তাঁর কাব্যে প্রকৃতির সাথে এই লতাপাতা-গাছগাছালী পত্রপুষ্প আর পল্লবিত তরুশ্রেণীকে।

মহাকবি কালিদাস—যেমন বর্ষাকে নিয়ে তার কাব্যে রূপায়িত করেছেন মনের মাধুরীকে। ঠিক ভক্ত কবি জয়দেবও এই ষড়ঋতুর মাধুর্য্যপূর্ণ মধুময় বর্ণনা করেছেন তার অসামান্য গ্রন্থ গীতগোবিন্দে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির এই ঐশ্বর্য্যময়ী রূপকে নিয়ে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ

হেমন্ত শীত ও বসন্তকে নিয়ে অজস্র গান লিখেছেন। তার মধ্যে বর্ষা, আর পাগলার মতো ঋতুরাজ বসন্তকে নিয়ে তিনি কাব্যে কবিতায় নাটকে গানে, নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করেছেন "বসন্তবন্দনা"। বাংলার উৎসবকে এই আশ্রম থেকে কোনওভাবেই তিনি বিদায় করেননি। এই উৎসবগুলি নূতন নামে নূতন ভাবনায়, আশ্রমিক ও আশপাশের গ্রামের মানুষের মনে প্রথাগত রীতিকে বাদ দিয়ে নাচেগানে নব নব রূপায়িত করেছেন অন্যভাবে।

এই ভারতের এই বাংলার সুপ্রাচীন উৎসব "হোলি"। উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল বাঁধনহারা আনন্দের রংয়ের উৎসব এই হোলি উৎসব। এই উৎসবের উৎশৃঙ্খলাকে হটিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে নূতন প্রথায় অন্য ভাবনায় সুন্দর নাচে গানে আবৃত্তিতে হোলি উৎসবকে বসন্তোৎসব বলে চিহ্নিত করলেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমকে মুখরিত করলেন অপূর্ব সুরের বিচিত্র বর্ণের ঐক্যতানে লীলায়িত ছন্দের অপরূপ মাধুর্য্যে।

ঋতুরাজ বসন্তকে আহ্বান করলেন প্রকৃতির পূজারী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ—

"এসো হে এসো হে আমার বসন্ত এসো,
আজি দখিনদুয়ার খোলা-এসো হে
এসো হে এসো হে আমার বসন্ত এসো।"

এখন একটু পিছনের দিকে চোখ রাখি—সবেমাত্র ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম বিদ্যালয় শুরু হয়েছে পাঁচটি ছাত্রকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথও তখন আশ্রমের ছাত্র। সবেমাত্র তারুণ্যের স্পর্দ্ধায়, সেই কিশোর ভাবনায় প্রাচীন বাংলার উৎসবগুলি তাঁর মনে উঁকি দেওয়াতে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ৪ঠা মাঘ ১৯০৭ সালের ১৮ জানুয়ারী শ্রীপঞ্চ মীর দিনে তিনি বসন্ত বন্দনার আয়োজন করেন। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ স্মরণীয় দিন শ্রীপঞ্চ মী, এ দিনটিই ছিল বসন্ত বন্দনার।

এর প্রায় বছর পনের পর কবি হঠাৎ খেয়ালে ঋতুরাজ বসন্তকে সাদর আহ্বান জানিয়ে লিখলেন "ফাল্গুনী" নাটক। শ্রদ্ধার সাথে উৎসর্গ করলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের কাণ্ডারী দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে—কবি বাউলের একতারার মতো সমর্পণ করিলাম। ১৫ই ফাল্গুন ১৩২২। কবিগুরু এর সাত বছর পর (কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কবির মনের এই দুর্লভ স্মৃতি, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষন, বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তবন্দনা) শমীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় অনুষ্ঠান বসন্ত বন্দনার জন্য প্রস্তুতি নিলেন।

কবিগুরু সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে লিখলেন "বসন্ত" নাটকটি, উৎসর্গ করলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে। স্মরণীয় বরণীয় সেই দিনটি ছিল ১০ই ফাল্গুন ১৩২৯ বঙ্গাব্দ।

এদিন সন্ধ্যায় কলাভবনের প্রাঙ্গণে স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ছাত্রীদের নিয়ে গানে গানে অধীর আনন্দে মেতে ওঠেন। গুরুদেবের পোষাক ছিল বাসন্তীরঙের, মেয়েদের পোষাক ছিল লালপাড়ের বাসন্তীরঙের শাড়ী, অঙ্গসজ্জা মাথার ফুলহারে সেজে গুরুদেবের সাথে-গানে গানে উচ্ছল আনন্দে মেতে ওঠেন।

বসন্ত পঞ্চ মীর পরই বাসন্তী পূর্ণিমার জন্য পণ্ডিতজী ভীমরাও শাস্ত্রী ও দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর জোর কদমে প্রস্তুতি নিলেন বসন্তোৎসবের জন্য। দেখতে দেখতে ১৯২২-এর (১৩২৯ সালের ১৯শে ফাল্গুন) বাসন্তী পূর্ণিমা আশ্রমে চলে এলো। শান্তিনিকেতন আশ্রম চাঁদের কিরণ শোভায় ভেসে চলেছে। পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীর মৃদঙ্গের বোলে, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুরের মাধুর্য্যে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসন্ত বন্দনা করেন। এই অনুষ্ঠানের শেষে নৈশ প্রীতি-ভোজে সকলেই পরম তৃপ্তি পান।

পরের বছর ১৩৩০ বঙ্গাব্দ/১৯২৩ সালে বসন্তোৎসবের প্রস্তুতির জন্য গুরুদেব শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, স্থপতি শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর শান্তিদেব ঘোষের সঙ্গে এ বিষয়ে নানারূপ আলোচনা করেন। তাঁর এই বসন্তোৎসবকে আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য এনারা সব এগিয়ে এলেন। নন্দলাল বসু, সুরেন কর কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে উৎসব প্রাঙ্গণকে অপরূপ আল্পনায় সাজিয়ে দিলেন। উৎসব প্রাঙ্গণের মধ্যভাগে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের আসন। তার পাশেই সঙ্গীতাচার্য্য দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের দলের আসন, আর দুপাশে আশ্রমিকদের বসবার জন্য আসন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ স্বতস্ফূর্ত ভাবে গাইলেন—"তোমায় গান শোনাবো, তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখ"...

কবির প্রাঙ্গণময় এলোমেলো বাতাসের ফাগুন মাসের উচ্ছ্বাসে ১৯৩০ সালের ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে বসন্তোৎসবের জন্য লিখলেন 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থ।

১৯৩১-এ গুরুদেব খুব জাঁকজমক করে বসন্তোৎসবের প্রস্তুতি নিলেন। গানের পর গান লিখে সঙ্গীতাচার্য্য দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শেখাচ্ছেন, সেই সাথে আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের। এই সাথে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিনী প্রতিমা বৌঠান শেখাচ্ছেন নাচ-একটার পর একটা, এই নাচ ও গানের মহড়া চলছে উদয়নে—প্রতি সন্ধ্যায় স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সামনেই।

দিন এগিয়ে এলো বসন্তোৎসবের। ১৯৩১ সালে আম্রকুঞ্জে 'নবীন' নৃত্যনাট্যের গানগুলি দিয়ে শুরু হলো বসন্তোৎসব।

"ফাগুন হাওয়ায় করেছি যে দান
আমার আপন হারা প্রাণ
আমার বাঁধন ছেঁড়াপ্রাণ
তোমার বাঁধন ছেঁড়াপ্রাণ"

কবি স্বয়ং উৎসব মঞ্চে বসে কবিতাগুলির আবৃত্তি আর সেই সাথে গানগুলির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলেন। এরই ফাঁকে ফাঁকে ছাত্রীরাও নাচেগানে আম্রকুঞ্জকে ইন্দ্রলোকের মাধুর্য্যে ভরিয়ে দিল। অসামান্য সাফল্যের সাথে এই "নবীন" নৃত্যনাট্যটি নাচেগানে আবৃত্তিতে শান্তিনিকেতন-এর আশ্রমিকদের মনপ্রাণ ভরিয়ে দিল। ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে এই গান সবসময়ই, কবিরও ভালো লাগতো। এমন সুন্দর অনাবিল স্বর্গীয় ভাবনায় "নবীন" নৃত্যনাট্যটি আশ্রমে উপস্থাপনার পর কবির মনে হলো শান্তিনিকেতন আশ্রমের যে ভাবনা-শিক্ষা-সাধনা, এগুলি কলকাতার সুধী শিক্ষিত উচ্চবিত্তেরা মনেপ্রাণে গ্রহণ করুক। তিনি এই বছরই ১৯৩১ সালের ৭ই মার্চ শান্তাদেবীকে চিঠি দিয়ে জানালেন—"ভেবেছিলুম কলকাতায় শীঘ্র যাবোনা, কিন্তু সেখানে একটা বসন্তোৎসবের পালা হবে, আমি উপস্থিত না থাকলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। তাই জনসাধারণের দরবারে হাজিরা দেওয়া চাই।" এই সাথে একই দিনে ৭ মার্চ তাঁর ভাইঝি ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে

লিখলেন "আমি এখন আছি গান নিয়ে,—কতকটা খ্যাপার মতো ভাব।"

শান্তিনিকেতন আশ্রমের বসন্তোৎসবে "নবীন" মঞ্চ স্থ হবার পরই নৃত্যনাট্যের দলবল ও শিল্পীদের নিয়ে তিনি কলকাতায় সরাসরি এলেন। শিল্পীরা হলেন অমিতা সেন (খুকু), অরুন্ধতী ঘোষ, রমা মুখার্জী, মন্দিরা গুপ্ত, শান্তিদেব ঘোষ, সাগরময় ঘোষ, মোপারা, পিনাকিন ত্রিবেদী আরও অনেকেই ছিলেন।

সঙ্গীতে ছিলেন সঙ্গীতাচার্য্য দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অভিনীত হলো নিউ এম্পায়ার থিয়েটারের স্টেজে, পরপর দুদিন ধরে। এই প্রথম আশ্রমের পর বাইরে বলতে কলকাতায় অসমান্য সাফল্য—উচ্ছ্বসিত প্রশংসা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আশ্রমের, জয়ধ্বনি, সবার মুখে একটা কথাই—এমন সুন্দর—"বসন্ত বন্দনার" সুন্দরের অর্ঘ্য নাচে গানে আবৃত্তিতে অভিনয়ে কেউ কখনও ইতিপূর্বে তখনও পর্যন্ত দেখেননি।

পরবর্তীকালে কবিগুরু আশ্রমের সঙ্গীত ভবনের শিল্পীদের নিয়ে কলকাতায় বহুবার এবং দিল্লী ও অন্যত্র এইসব নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে রবীন্দ্রভাবনাকে সকল স্তরের মানুষের মনের কোণে পৌঁছে দিয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমকে বিশ্ববন্দিত করেছেন।

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনী তৃতীয় খণ্ডে বলেছেন—"কবিগুরু এই বসন্ত বন্দনাকে নিয়ে অজস্রগানে তার গানের ডালি ভরিয়েছেন; প্রেম, বিরহ, প্রকৃতির বনভূমি, ফুলপাতা দখিন হাওয়া বনপথ ইহারাই পাত্রপাত্রী বসন্তের নানা অঙ্গরূপের বাণীবাহক।" কবিগুরু নটরাজ গীতি আলেখ্যে 'বসন্ত

(এরপর ৯ পাতায়)

জীবনী গ্রন্থটি নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করবে

সাধনানন্দ মিশ্র

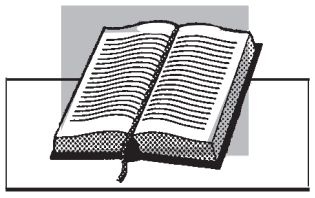

ভারতবর্ষের মধ্যে এখন বহু অঞ্চল রয়েছে, যেখানে বহু মহাপুরুষ ও কৃতী সন্তান পরপর জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের কর্মের মাধ্যমে দেশের ধার্মিক ও সংস্কৃতির প্রবাহের ধারা অটুট রেখে ভারতের সাংস্কৃতিক

পুস্তক প্রসঙ্গ

জীবনধারা তথা মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়েছেন। এটা ভারতের মাটির গুণ। বঙ্গদেশেও (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ) অনেক প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ও সজ্জনগণের আবির্ভাব ঘটেছে, অনেক স্থানেই তাঁদের কর্মধারার স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে এক একটি অঞ্চলে, তাঁদের সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এইসব গুণীজনের জ্ঞান ও কর্মের আলোকে সারাদেশ উজ্জ্বল হয়েছে। প্রবাদ রয়েছে, 'গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারাণসী সমতুল'। গঙ্গার পশ্চিম কূলে অবস্থিত হুগলী জেলায় বহু সাধুসন্ত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে ভারতকে সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছেন। তাঁদের অনেকেই স্বনামধন্য, আবার অনেকেই অখ্যাত, অজ্ঞাত ও লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গিয়ে তাঁদের জ্ঞান ও কর্মের দীপ্তি বিকিরণ করে চলেছেন তাঁদের প্রয়াণের পর এখনও।

'শ্রীরামপুরের গুণীজন' নামক আলোচ্য গ্রন্থটিতে লেখক ডঃ প্রীতিমাধব রায় শুধুমাত্র শ্রীরামপুর অঞ্চলে প্রয়াত সাধুসন্ত, মহাপুরুষ, দেশব্রতী, সমাজসেবী, একাধারে জ্ঞানী, পণ্ডিত ও আচার্যদের নাম এবং তাঁদের অভূতপূর্ব ও অমর জীবনকাহিনীর তথ্যগুলি বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করে আমাদের বর্তমান প্রজন্মের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। যাঁদের কথা বলা হয়েছে, তাঁরা কোনও বিত্তশালী বা উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি ছিলেন না, দারিদ্র্যের পেষণে জর্জরিত থেকেও সরল, সাদাসিধে, নিঃস্বার্থ ও ত্যাগময় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত থেকে জ্ঞান ও গৌরবের উচ্চসীমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে সারাদেশের মানুষকে তাঁদের প্রজ্ঞাপ্রভার আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন। শ্রীরামপুরের গুণীজন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক শ্রীরামপুর মিশন ও কলেজ সম্পর্কিত গুণী ব্যক্তিদের কথা বলেননি, কারণ, তাঁরা বহুলপ্রচারিত। কিন্তু যাঁদের কার্য্যকলাপ কেউ জানেন না, যাঁদের নীরব কষ্টের কোনও প্রচার হয়নি, যাঁরা বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গিয়েছেন, তাঁদেরই জীবনকাহিনী প্রকাশ করেছেন। এঁরা কেউ শ্রীরামপুরে জন্মেছেন, বা অন্যত্র জন্মগ্রহণ করে শ্রীরামপুরকেই তাঁদের কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছেন, এমন কয়েকজন শ্রদ্ধেয় ও প্রণম্য গুণীজনের কথা বলা হয়েছে। এই তথ্য সংগ্রহ অভিযানেই লেখকের তীর্থযাত্রা ও সাধুসঙ্গ লাভ হয়েছে। প্রয়াত মনীষীদের কথা শুনতে শুনতে লাভ করেছেন পুণ্য সাধুসঙ্গের দুর্লভ ফল। কে নেই শ্রীরামপুরের এই গুণীজনদের মধ্যে? প্রধান প্রধান শিক্ষাবিদ্, বিজ্ঞানসাধক, গণিতজ্ঞ, সাহিত্যবিদ, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের আচার্য্য পণ্ডিতগণ, অধ্যাত্মমার্গের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত সাধুসন্তগণ, বিপ্লবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শ্রমিকদরদী, সমাজসেবক, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, চিকিৎসক, সঙ্গীতসাধক প্রভৃতি বহু অখ্যাত অজ্ঞাত প্রতিভাধরদের জীবন-কাহিনী নিয়ে একটি সুন্দর মালা গেঁথেছেন লেখক। এঁদের কথা পড়তে পড়তে শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে, বিস্ময়ে মাথা নুয়ে আসে। অল্পপরিসরে সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। প্রসিদ্ধ যোগিরাজ শ্রীমৎ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর প্রধান শিষ্য ছিলেন শ্রীমৎ যুক্তেশ্বর গিরি মহারাজ, যাঁর জন্ম ও কর্মস্থল ছিল শ্রীরামপুরেই।

লেখক খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে বহু পরিশ্রম করে শ্রীরামপুরের যে ৬২ জন গুণীজনের জীবনকাহিনী সংগ্রহ করে জনসাধারণকে উপহার দিয়েছেন তা শুধু শ্রীরামপুরের অধিবাসীদেরই নয়, এর বাইরেও যাঁরা থাকেন, তাদের প্রত্যেকেরই পড়া উচিত। বিশেষতঃ আধুনিক প্রজন্মের ছেলেরা যাদের ত্যাগব্রতী আদর্শ জীবন সম্পর্কে কোনও জ্ঞান নেই, যারা অর্থ ও কামনাপূরণ, বিশ্বাসবহুল দিশাহীন ছন্নছাড়া জীবন ছাড়া কিছুই বোঝে না, তাদের এই অমূল্য গ্রন্থটি পড়া উচিত। এই সব আদর্শ মানবদের জীবনচর্য্যা ও কর্মকাণ্ড তাদের অনেককেই উদ্বুদ্ধ করবে এই আশা করি, তথ্যবহুল এই গ্রন্থটির বহুলপ্রচারই কাম্য। গ্রন্থের শেষে লেখকের বিশেষ পরিচয় গ্রন্থের মান বৃদ্ধি করেছে, কারণ তিনিও শ্রীরামপুরবাসী। হিন্দুসংস্কৃতিমনস্কতা প্রচারের জন্যই তিনি এত পরিশ্রম করে এতগুলি গুণীজনের মালা গেঁথেছেন।

শ্রীরামপুরের গুণীজন ঃ লেখক ও প্রকাশক— ডঃ প্রীতিমাধব রায়, ৩৩এ, চাতরা চৌধুরীপাড়া বাই লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী, মূল্য ৪০্ টাকা মাত্র, পৃষ্ঠাসংখ্যা-১৯৪।

সংগ্রহে রাখার লিটল ম্যাগাজিন

বইমেলা উপলক্ষে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের ৫০০ বছর উপলক্ষ্যে 'দশদিশি' পত্রিকার বিশেষ 'চৈতন্য সংখ্যা' প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটির দাম ১৮০ টাকা। 'আমার রূপসী বাংলা' পত্রিকাটির 'যাদুঘর সংখ্যা'। 'কোরক' পত্রিকার বিশেষ 'রামায়ণ' সংখ্যা। দাম ১০০ টাকা। 'তেহাই' পত্রিকার বিশেষ 'উত্তমকুমার' সংখ্যা। পত্রিকাটির দাম ৩০০ টাকা। 'শব্দ' পত্রিকার 'উৎপল দত্ত' সংখ্যা, 'শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়' বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে 'শিল্পী সরণি'। পত্রিকাটির দাম ২০০ টাকা। হৃদয় পত্রিকার বিশেষ বিষয় 'রবীন্দ্রনাথ ও বাউল'। দাম ১০০ টাকা। পত্রিকাগুলি মিলবে কলেজ স্ট্রিটের পাতিরাম বুকস্টলে।

বই পাড়ার খবরাখবর

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে পবিত্রকুমার ঘোষ রচিত 'নেতাজির মৃত্যুকাহিনী অসত্য' বইটি। সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু নিয়ে মুখার্জী কমিশনের রিপোর্টকে কেন্দ্র করে নিখুঁত বি(-ষণ করেছেন লেখক এই গ্রন্থে। বইটির দাম ১০০ টাকা। এখান থেকেই প্রকাশিত হয়েছে নিরঞ্জন চত্র(বর্তীর 'ভারতের সাধুসন্ত'। এই বইটির দাম ১০০ টাকা। অমিয় শঙ্কর চৌধুরী রচিত 'মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মের তারিখ' প্রকাশিত হয়েছে পুস্তক বিপণি থেকে। এই বইটির দাম ১০০ টাকা। অভিরূপ সরকারের 'বাংলার মুখ' বইটি প্রকাশিত হয়েছে সপ্তর্ষি প্রকাশন থেকে। শি(া রাজনীতি অর্থনীতি বিষয়ক এই প্রবন্ধসংকলিত বইটির দাম ১৫০ টাকা। যোগমায়া প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'রাঢ়ের বিরল মাতৃপূজা' বইটি। অমিয় ভট্টাচার্য রচিত এই বইটির দাম ২০০ টাকা। প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু রচিত 'যে মহাত্মা সারাজীবন দ্বিচারিতা করে গেছেন' বইটি পাওয়া যাবে দে বুক স্টোর থেকে। এই বইটির দাম ১০০ টাকা। উনিশ শতকের জাতীয় মেলার ইতিহাস 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' প্রকাশিত হয়েছে 'তালপাতা' থেকে। যোগেশচন্দ্র বাগল ও শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় রচিত এই বইটির দাম ৩০০ টাকা। জীবনতারা হালদার রচিত 'অনুশীলন সমিতির ইতিহাস' বইটির দাম ৮০ টাকা। বইটি পাওয়া যাবে ৪ কাশীমিত্র ঘাট স্ট্রিট কলকাতা-৩ থেকে। দ্বারিকানাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বস্তিবেস্টিত নগর ঃ হাওড়া সদর' বইটি প্রকাশিত হয়েছে ভাস্বতী থেকে। মধুমুয় পাল সম্পাদিত গাঙচিল থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'মরিচঝাঁপি ঃ ছিন্ন দেশ ছিন্ন ইতিহাস' বইটি। বইটির দাম ২৫০ টাকা।

শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসব

(৮ পাতার পর)

বন্দনায়' লিখেছেন—

"মনে রবে কি না রবে আমারে
সে আমার মনে নাই মনে নাই গো।
ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে
অকারণে গান গাই গো।।

এই শান্তিনিকেতনের পরিবেশটা এমনি যে, শিশু যেমন মায়ের কাছে থেকে কথা বলা শেখে, শুনতে শুনতে খেলার আনন্দে শিখে যায় কথা বলা, শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরাও তেমনি করে পায় গানকে, রবীন্দ্র সঙ্গীতকে মনে প্রাণে অন্তরে।

গুরুদেব নিজেও বলেছেন "আমার গান আমার মনের গান, তাতে আনন্দ পাই শুনলে আনন্দ হয়।"

এতো গেলো ১৯৩১ সালের জাঁকজমক করে বসন্তোৎসবের, সেদিনের সুন্দর আশ্রমিক ছবি। এরপর থেকে প্রথাগত রীতিতে সেই অতীত ঐতিহ্যকে নিয়ে সঙ্গীত ভবন, কলাভবন, সক্রিয়ভাবে এই অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দরের জন্য—স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, শান্তিদেব ঘোষ, পরে কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (মোহরদি), নীলিমা সেন (বাচ্চুদি) আরও অনেকেই তো ছিলেনই।

অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের এই বসন্তোৎসব হয়ে আসছে। গান ও নাচেরও পরিবর্তন হয়েছে! সময়কে কমিয়ে দেওয়াও হয়েছে। বর্তমান সমাজের সামাজিক অস্থিরতাও অবক্ষয়ের কারণে। সমগ্র বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উত্তাল বাঁধনহারা মানুষের ঢেউ এই আশ্রমের বসন্তোৎসবের অধীর আনন্দের অমৃতের প্রসাদে তৃপ্ত হয়।

আর ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসেন মৌমাছির মতো গুনগুনিয়ে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীর দল।

দোলপূর্ণিমার দিন খুব সকালে বৈতালিকগান দিয়ে শুরু হয় বসন্তোৎসব।

স্বতঃস্ফূর্ত মনের আনন্দে গাইতে গাইতে এগিয়ে চলে শোভাযাত্রা—

"ওরে গৃহবাসী, খোলদ্বার খোল
লাগলো যে দোল।
স্থলেজলে বনতলে
লাগলো যে দোল।
ওরে গৃহবাসী..."

এইগানে মেয়েদের হাতে থাকে তালপাতার ঠোঙার মধ্যে আবীর, কারও হাতে খঞ্জনী, কারও হাতে মন্দিরা, গানের ছন্দে তালে,— খোল খঞ্জনী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা বেজে বেজে চলে। সুন্দর সুসজ্জিত ছেলের দল-এর হাতে থাকে ছোট ছোট সুন্দর নানাবর্ণের চিত্রিত লাঠি—তারা এই ছন্দে পুলকিত আনন্দে নাচের সাথে চলে কাঠি নাচ—আর সেই গানটি হলো—

"ওরে মাতরে, ওরে মাতরে সবে আনন্দে
আজি নবীন প্রাণের বসন্তে
ওরে মাতরে—সবে আনন্দে
ওরে আয়রে সবে আয়রে..."

শালবীথি পার হয়ে দীর্ঘ এই নাচের সুদৃশ্য দল নেচে নেচে প্রবেশ করে আম্রকুঞ্জের সমাবর্তন বেদীতে (জহর বেদী), সাজিয়ে রাখা হয় রঙ-বেরঙের আবীর, সেখানেই সেই আসরের মাঝে হয় নৃত্যগীতের মাঝে চলে বসন্তোৎসব।

ইদানীং গৌর প্রাঙ্গণের মুক্ত মঞ্চের অনুষ্ঠানের পরই যথারীতি সেই প্রাচীন ধারায় আম্রকুঞ্জে, শালবীথিতে, মাধবীকুঞ্জে, ঘণ্টাতলার বটতলায়, কলাভবনে, সঙ্গীত ভবনে নানা স্থানে ছাত্রছাত্রী, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীর দল, দর্শকেরা মেতে ওঠেন বসন্তোৎসবের নাচে গানে;দুপুরকে পার করে উচ্ছল আনন্দে মেতে ওঠেন।

সন্ধ্যায় যথারীতি উপচে পড়া ভীড়ের মাঝে গৌর প্রাঙ্গণের মুক্ত মঞ্চে অভিনীত হয় নৃত্যনাট্য, কোনও বছর শ্যামা কোনও বছর চিত্রাঙ্গদা, কোনও বছর চণ্ডালিকা আবার ভানু সিংহের পদাবলী। কবি এই মাধুর্য্যপূর্ণ বসন্তকে নিয়ে বসন্ত বন্দনার অজস্রগানও লিখেছেন, গীতিমাল্য, গীতালী, গীতবিতানে তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

সেজে উঠলো আশ্রম শান্তিনিকেতন, আম্রমঞ্জরী শালের পুষ্পিত মঞ্জরী, বাদরলাঠির হলুদে কৃষ্ণচূড়া পলাশ শিমূলের রক্তিমলালে শুভ্র কুর্চির স্নিগ্ধ গন্ধে নীলমনি লতার ঘননীলে শিরীষের হলুদে সবুজে আর রঙীন অশোকের লালের ছোঁয়াতে আবীরের টকটকে লালে চলে আবীর খেলা। ধবনিত হয়ে ওঠে আম্রকুঞ্জে—গানে গানে, নাচে গানে—

"রাঙিয়ে দিয়ে যাও, যাওগো এবার
যাবার আগে রাঙিয়ে দিয়ে যাও।
আপন রাগে
তোমার গোপন রাগে
তরুণ হাসির অরুণ রাগে
অশ্রুজলের করুণ রাগে
রাঙিয়ে দিয়ে যাও-যাওগো এবার।"

নবীন আনন্দের জোয়ারে, কাঞ্চনের সুন্দর জাফরান রঙে দখিনের উথাল-পাথাল উচ্ছৃঙ্খল মাতাল সমীরণে আমের পুষ্পিত মঞ্জুরীকে সাড়া দিয়ে মৌমাছি পাড়া চুপিসারে অজান্তে জেগে ওঠে। নিঃশব্দ সঞ্চারে আশ্রম জেগে ওঠে। লাল সূর্যের রঙে তরুশ্রেণীর মর্মর কলছন্দে মাধবীর অপূর্ব স্নিগ্ধ গন্ধে সুরের আকাশের ভেসে চলে শান্তিনিকেতন-এর বসন্তোৎসব।

ব্রিগ্রেড-এর নাম বদল

জ্যোতি বসু মারা যাবার পর একমাসও অতিবাহিত হয়নি। এরই মধ্যে সিপিএম জ্যোতি বসুর (এ আজাদি ঝুটা হ্যায়, নেতাজীকে তেজোর কুকুর যিনি বলেছিলেন) নামে ব্রিগ্রেডের নামকরণ করার জন্য কেন্দ্রে দরবার করেছে। তাদের দেখাদেখি কংগ্রেসও গান্ধীভক্তির নমুনা স্বরূপ ইন্দিরা গান্ধীর নামে করার জন্য রাজ্যের বহু নেতাও কেন্দ্রে দরবার করেছে। ভাবতে অবাক লাগে জ্যোতি বসু ও ইন্দিরা গান্ধীর ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে অস্ত্র ধরে সমরাঙ্গনে নামার কোনও অবদান নেই। দুজনেই স্বাধীনতার পর চেয়ারে বসে মৌরসীপাট্টা করে দেশ ও রাজ্যকে শাসন করেছেন। তাদের নামে রাস্তা বিমানবন্দরের নামকরণের প্রস্তাবের মধ্যে আন্তরিকতার থেকে চাটুকারিতার প্রভাবই পরিলক্ষিত হয় বেশী। যে ময়দানে সেনাবাহিনীর প্যারেড হয় যেটার সাথে সেনাবাহিনীর আত্মিক যোগাযোগ বেশী, সেই প্যারেড গ্রাউন্ড-এর নাম জ্যোতি বসু বা ইন্দিরা গান্ধীর নামে নামকরণের কি যৌক্তিকতা বা সার্থকতা আছে?

আবার অনেকে মনে করছে দুদলকেই খুশী করতে ইন্দিরা-জ্যোতি ময়দান করা হোক। এদের আবদার ও আদিখ্যেতা দেখলে মনে হওয়া স্বাভাবিক ওই দুজনের পূর্বপুরুষ হয়তো বা ইংরেজদের নিকট হতে ওই ময়দানটি ইন্দিরা গান্ধী বা জ্যোতি বসুর নামে কিনে রেখে গেছেন। কংগ্রেস মনে করেছে দেশের সকল খেলা সকল সম্পত্তির উপরই গান্ধী পরিবারতন্ত্র কায়েম করবে। যেমন ধরা যাক্ খেলাধুলার সাথে সম্পর্ক না থাকলেও 'সঞ্জয় গান্ধী গোল্ড কাপ (হকি প্রতিযোগিতা), রাজীব খেল রত্ন (ক্রিকেট খেলায় সর্বোচ্চ সম্মান), ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দর, কলকাতার রেড রোডের নাম ইন্দিরা গান্ধীর নামে রাখা হয়েছে, মূর্তি তো দেশের চতুর্দিকে। কিন্তু কেন? দেশকে যারা পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করেছেন সেই সব স্মরণীয় ব্যক্তিদের নামে কিছু করা কি শেষ হয়ে গেছে? এবার কি তাই সেকেন্ড লিস্ট ধরা হয়েছে?

—দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী, বর্ধমান

দেশপ্রেম দিবস

সিপিএম সম্প্রতি নেতাজীর জন্মদিনকে 'দেশপ্রেম দিবস' রূপে পালনের প্রস্তাব পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। আর এই প্রস্তাবটি তারা পাঠিয়েছে কেন্দ্রে এমন একটি সময় যখন জ্যোতি বসু আর নেই ইহজগতে। তবে প্রস্তাবটি সাধু, কিন্তু এর মধ্যে আন্তরিকতা কতটা রয়েছে তা নিয়ে আছে যথেষ্ট সন্দেহ। কারণ দলটি যে সিপিএম। তাঁদের ধারণা, সিপিএম রাজনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়াতে নেতাজিকে করছে 'শিখন্ডী'—তাঁকে আশ্রয় করে রক্ষা করতে চাইছে নিজেদের অস্তিত্ব।

সিপিএম বা পূর্বতন সিপিআই কোনদিনই নেতাজীর নেতৃত্বকে স্বীকার করেনি। বরং নেতাজিকে তারা করেছে চূড়ান্ত অবমাননা। তারা তাঁকে বলেছে— কুইসলিং, সন্ত্রাসবাদী, তোজোর কুত্তা, বিশ্বাসঘাতক (পঞ্চ মবাহিনী), দেশদ্রোহী, ভারত আক্রমণকারী ইত্যাদি।

ব্যঙ্গচিত্রে নেতাজীকে নিয়ে যে সব ছবি আঁকা হয়েছে তাদের দু' একটির ভাষা এরূপ ঃ (১) 'বামন' নেতাজী একজন জাপানী সৈনিকের হাত ধরে ভারতের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছেন (২) একজন জাপানী সৈনিকের প্রহরায় তালগাছের উপর থেকে দূরদিগন্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণরত নেতাজী সুভাষ, ইত্যাদি।

'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় লেখা হয়েছে—"বর্মার পতিতালয়গুলোতে সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছেন (সুভাষ বোস)।..."

ওই পত্রিকায় আরও লেখা হয়েছে নেতাজীর বিরুদ্ধে বি. টি. রণদিভে লিখেছেন, "সুভাষ বোসের আহ্বান নিশ্চি তরূপেই প্রত্যেকটি সচেতন ভারতবাসীর কাছে পৌঁছবে এবং কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনসাধারণ তাঁকে সেই উত্তরই দেবে যা একজন বিশ্বাসঘাতকের প্রাপ্য, সৎ ও দেশপ্রেমিক নাগরিকদের কাছ থেকে। তাই, যদি বোসের 'মুক্তি ফৌজ' নামধারী তস্করবাহিনী দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠনের অভিপ্রায়ে ভারতের মাটিতে পা রাখবার দুঃসাহস দেখায়, তবে সেই ঘৃণ্য কাজের যোগ্য জবাব তারা আমাদের কাছ থেকে পাবে।"

কাজেই নেতাজীর চরিত্র ও সুনাম হননে কমিউনিস্টরা (বর্তমান সিপিএমও) যে কত নিচে নেমে যেতে পারেন তার দু'একটা উদাহরণ উপরে দেওয়া হল। তাই প্রশ্ন, বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী ও নেতাজী বিরোধী সিপিএম করবে নেতাজীর জন্মদিনে তাঁকে স্মরণ করে 'দেশপ্রেম দিবস' পালন?

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া

অপ্রিয় হলেও সত্যি

পশ্চি মবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রয়াণের পর যা ঘটলো তা তাঁর জীবদ্দশায় ঘটলে তিনি যারপরনাই আনন্দিত ও গর্বিত হতে পারতেন। বাংলার উন্নয়নে বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখার্জীদের সঙ্গে তুলনাই হয় না দীর্ঘদিনের মুখ্যমন্ত্রিত্বের অধিকারী জ্যোতি বসুর। একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মৃত্যুর পর যে ধরনের মর্যাদা ও সম্মান পেলেন তা কি সত্যিই প্রাপ্য ছিল? মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আপামর বাঙালীর হৃদয়ে তিনি কতটুকু ঠাঁই করে নিয়েছেন? ভুললে চলবে না বানতলা, ধানতলা, মরিচঝাঁপিতে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, রাজ্যজুড়ে রাহাজানি, খুনোখুনি সহ আইনশৃঙ্খলার অবনতি, শিক্ষা ব্যবস্থার করুণ হাল, প্রশাসনে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া, ছেলে চন্দন বসুকে কোটিপতি করে তোলা, রাজ্যে বেশকিছু কলকারখানা বন্ধ ও রাজ্যে অনুপ্রবেশকে মদত দেওয়ার মতো ঘটনাগুলো জ্যোতি বসুর দীর্ঘদিনের মুখ্যমন্ত্রিত্বের উজ্জ্বল অবদান। বন্দুকের নলের জোরে, রিগিং, ছাপ্পাভোট ও নানা কৌশলের মাধ্যমে ভোটে জয়লাভ করে বামফ্রন্টকে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় রাখার নজিরবিহীন ঘটনার খলনায়ক জ্যোতি বসু। বি.জে.পি. আর এস এস এর মতো জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিক সংগঠনগুলো সম্পর্কে নানা মিথ্যাচার ও অপবাদের মাধ্যমে রাজ্যে সংখ্যালঘু তোষণ ও হাঙ্গামা বাধাবার নেপথ্যে ছিলেন জ্যোতি বসু। প্রচুর অর্থব্যয়ে পুত্র পরিবারসহ বারংবার নানা অছিলায় বিদেশভ্রমণসহ বিলাসবহুল জীবনযাত্রার মূর্ত প্রতীক সর্বহারার নেতা জ্যোতি বসু। হতে পারে বামপন্থী আন্দোলনের তিনি মহান্ নেতা ও বামফ্রন্ট সরকারের প্রধান কারিগর। কিন্তু প্রচার মাধ্যম থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-নেত্রীদের অতিরিক্ত উদ্দীপনা দেখানো বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। একথা অপ্রিয় হলেও সত্যি।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলি

টিকিট কাউন্টার

বদরপুর-ভৈরবী (৮৬৭ ডাউন/৮৬৮ আপ) যাত্রীবাহী (অবহেলা?) ট্রেন গাড়ীটি বদরপুর ছাড়ার কথা ৭-৪০ মিঃ-এ। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় ঘণ্টাখানেক দেরীতে ছাড়ে। তার পরে মোটামুটি ঠিকই যায়। ফেরার পথে রামনাথপুর থেকে জামিরা, আলগাপুর থেকে কাটাখাল যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে কাঠ, শাক-সব্জি, কাঁদি-কাঁদি কলা তথা প্যাসেঞ্জার উঠতে নামতে থাকে। কয়েকটি স্টেশনে গাড়ী থামে কিন্তু টিকিট দেবার ব্যবস্থা নেই। স্থানীয় পত্রিকায় খবর—জামিরা স্টেশন মাস্টার চাবি লাগিয়ে কোথায় চলে গেছেন। কয়েকদিন কোনও খবর নেই, মালগাড়িতে কয়েক লক্ষ টাকার কাঠ চলে যাচ্ছে। রেল বা বন বিভাগ কারুর কাছে কোন খবর নেই। মাসে এক-আধদিন লালা বা হাইলাকান্দিতে প্যাসেঞ্জার গাড়ী থেকে কাঠ ধরা হয়। সেটাও স্থানীয় নেতাদের জাহির করার জন্য। মুষ্টিমেয় কয়েকজন রেলকর্মী এবং ছোট ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হচ্ছেন। অন্যদিকে রেল তথা বন বিভাগ রাজস্ব থেকে বঞ্চি ত হচ্ছে। ৮৬৮ ডাউন-কে কাটাখাল থেকে বদরপুর জং ১১ কি.মি.-র জন্য সময় সারণিতেই ৫৮ মিনিট সময় দেওয়া আছে। সুপরিকল্পিতভাবে বিপরীত দিক থেকে একই সময়ে আরেকটি গাড়ী কি (যা অনেক আগে ছিল) দেওয়া যায় না? স্থানীয় বড় শহর শিলচর, করিমগঞ্জ বা লামডিংগামী গাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সহজ হয় এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ উপকৃত হন তথা রেলেরও যথেষ্ট আয়ের সুযোগ হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সর্বোপরি মাননীয়া রেলমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—হরিসাধন কোণ্ডার, করিমগঞ্জ, অসম।

মুসলিম সমাজ অনুন্নত কেন

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্ষমতার অলিন্দে থাকা কিছু বিক্রীত রাজনৈতিক নেতা আর মান, যশ, খ্যাতি প্রতিপত্তির আশায় থাকা কিছু বুদ্ধি জীবী মুসলমান তথা সংখ্যালঘুদের জন্য অকাতরে অশ্রু বিসর্জন করে চলেছেন। মুসলমানরা অনুন্নত, অবহেলিত, শিক্ষার আলোক বঞ্চি ত, দারিদ্র্য-কশাঘাত জর্জরিত এবং আরও অনেক কিছু। এঁরা কিন্তু ভুলেও উচ্চারণ করেন না এর কারণ কি? দোষটা কার?

মুসলিম সমাজ বিশেষ করে নিম্নবিত্ত মুসলিম সমাজ পরিচালিত হয় কিছু অর্ধশিক্ষিত মোল্লা, মওলভী, মওলানার নির্দেশে। তাদেরই নির্দেশে মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষা পরিহার করে সন্তানদের মাদ্রাসা-মক্তবের শিক্ষায় শিক্ষিত করে। তাতে আর যাই হোক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রতিযোগীদের সঙ্গে চাকরীর প্রতিযোগিতায় সফল হওয়া যায় না। সরকারি চাকরীতে তাদের সংখ্যা ২ শতাংশ। এটা আশ্চর্যের কিছু নয়। কোরানের বিধান অনুযায়ী এবং মোল্লাদের নির্দেশে তারা একাধিক দার পরিগ্রহ করে। তাদের স্লোগান "হম পাঁচ, হমারা পাঁচিশ।" অর্থাৎ এক মিঞা সাহেবের চার বিবি, মোট পাঁচ, আর একেক বিবির পাঁচটি সন্তান, অর্থাৎ মোট পঁচিশ। মহল্লায় গেলে দেখা-যায় মুরগীর বাচ্চার মতো মানুষের বাচ্চা কিল্‌বিল্‌ করছে। খাজা নাজিমুদ্দিন-এর স্লোগান "পয়দা করে ফায়দা ওঠাও" এভাবেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। একটি হিন্দু পরিবারে যখন একটি বা দুটি সন্তান তখন একটি মুসলিম পরিবারে ৮-১০টি সন্তান খুবই স্বাভাবিক। এতজনের ভরণপোষণ-শিক্ষাদান স্বভাবতই ব্যয়সাধ্য। ফলে একটি হিন্দু পরিবার যখন মোটামুটি স্বচ্ছন্দভাবে থাকে তখন একই আয় সম্পন্ন একটি মুসলিম পরিবার দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হয়, হতে থাকে।

এ সমস্ত বিষয় অনুল্লেখিত, অনুচ্চারিত রেখে মুসলমানদের জন্য বিলাপ আর অশ্রু বিসর্জন ভণ্ডামির নামান্তর নয় কি? মাদ্রাসা-মক্তবের সংখ্যা বাড়িয়ে বা আলিগড়ের ধাঁচে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে মুসলমানদের উন্নয়ন কিছুই হবে না। আর সংরক্ষণের প্রশ্ন উঠলে বলতে হয় সংরক্ষণ হওয়া উচিৎ আর্থিক দৈন্যদশার কারণে। মুসলমান এই কারণে নয়। কারণ দরিদ্রের সংখ্যা হিন্দুদের মধ্যেও কিছু কম নেই। আমার এক জানাশোনা মুখার্জী ব্রাহ্মণ দৈন্যদশার কারণে বাড়ীতে তাঁত বসিয়ে সস্তার শাড়ী-গামছা বুনে দোকানে দোকানে সাপ্লাই করে গ্রাসাচ্ছাদন করছে। তারই আশ্রয়ে মানুষ তারই ভাগ্নে গ্র্যাজুয়েট, কম্পিউটার জানা, চাকরী পাচ্ছে না সংরক্ষণের সুযোগ নেই এই কারণে। শোনা যাচ্ছে রেলমন্ত্রী মহোদয়া মুসলমানদের জন্য ইতিমধ্যে রেলে ৩০ শতাংশ চাকরীর প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। এতে কি হবে? মাদ্রাসা-মক্তবে কোরান, হাদিস পড়া আরবি ফার্সি শেখা কিছু অনুপযুক্ত প্রার্থী হয়ত রেলে চাকরী পাবে। তাতে সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজের উন্নতি আদৌ কিছু হবে কি? অবশ্যই না। হজযাত্রীদের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা আছে। এতে দরিদ্র মুসলমানদের কতজন হজযাত্রায় অংশ নিতে পারে? কেউই না। হজযাত্রা ব্যয়বহুল। তাই শুধুমাত্র ধনী বা বিত্তশালী মুসলমানরাই হজ করে হাজী হয়ে আসতে পারে। তাই এতে অনুন্নত, শিক্ষার আলোক বঞ্চি ত মুসলমানদের কোন উপকারই হয় না। অথচ

জ ন ম ত

সরকারের কয়েক'শো কোটি টাকা প্রতিবছর হজযাত্রীদের জন্য ব্যয় হয়। অনুরূপ ভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য সরকার যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে তাতে কিছু মোল্লা, মওলভী, মাওলানা ছাড়া সামগ্রিকভাবে অনুন্নত মুসলমান সমাজের কোনও উপকারই হয় না।

তাহলে মাদ্রাসা তৈরী এবং শিক্ষার নামে কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি, মাসে ২০ হাজার টাকারও বেশী ইনকাম এমন পরিবারেও কোন ছাত্র বা ছাত্রীর উচ্চশিক্ষার সমস্ত ব্যয় বহন করা প্রভৃতি ছাড়াও হজ-হাউস নির্মাণ, মুসলিম ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল প্রভৃতির জন্য সরকারি ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক নেতাদের এত ব্যস্ততা কেন? এর একটাই কারণ সঙ্ঘবদ্ধ মুসলিম ভোট। মুসলিম ভোট ভিখারী রাজনৈতিক নেতারা মুসলিম দরদি সেজেছে এইজন্যই।

নিম্নবিত্ত মুসলিম সমাজকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা বেকারত্ব, অপুষ্টি প্রভৃতি থেকে মুক্তি পেতে হলে তাদের একাধিক বিবাহ বন্ধ করতে হবে, সন্তান সংখ্যা সীমিত করতে হবে, মাদ্রাসা শিক্ষা পরিহার করে, চাকরি কেন্দ্রিক আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সর্বোপরি পাকিস্তান প্রীতি ত্যাগ করে ভারতকে স্বদেশ মনে করে ভালবাসতে হবে।

পরম্পরা

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও তাঁর ধর্মভাবনা

ডঃ সুশীল কুমার সরকার

মুসলিম শাসনে বিপর্যস্ত হিন্দু সমাজের ক্রোড়ে ১৪৮৬ সালে শুভ ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সন্ধ্যাকালে শচীমাতার দশমগর্ভে বাংলার নদীয়ার নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। তপ্তকাঞ্চ নের ন্যায় তাঁর বর্ণ, আজানুলম্বিত তাঁর বাহুদ্বয়, চক্ষু দু'টি তাঁর পদ্মতুল্য, মুখশ্রী শরতের চন্দ্রকে জয় করেছে। বাল্যে তিনি বহু নামে পরিচিত হলেন—নিমাই, গৌর, গৌরাঙ্গ, বিশ্বম্ভর। তিনি মৃতবৎসা মায়ের পুত্র ও নিমবৃক্ষের তলে তাঁর আবির্ভাব। তাই তাঁর নাম নিমাই। তাঁর তনু উজ্জ্বল গৌর বর্ণের, তাই তাঁর নাম গৌর, গৌরাঙ্গ। তাঁর আবির্ভাবের পর ভাল বর্ষা হয় ও কৃষকরা প্রচুর ফসল পান, তাই এবং অগ্রজ বিশ্বরূপের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে অন্নপ্রাশনে তাঁর নাম হয় বিশ্বম্ভর। তাঁর নদীয়ায় আবির্ভাব ও পূর্বাশ্রমে তিনি নদীয়ায় বিহার তথা ধর্মপ্রচার করেন, তাই তিনি নদীয়াবিহারী। পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে রাত্রের অন্ধকার যেমন আলোকিত হয়, তেমনি তাঁর আবির্ভাবে জীবের মনের অন্ধকার শ্রীহরিনামের আলোয় আলোকিত ও তাঁর আবির্ভাবের জন্যই নদীয়া জগদ্বিখ্যাত, তাই তিনি নদের চাঁদ—নদীয়াচাঁদ। তিনি প্রভু এবং মহৎ ও মহান তাই তিনি মহাপ্রভু। তিনি গৌর ও ভক্তের নিকট ভগবান শ্রীহরি তুল্য, তাই তিনি গৌরহরি। সন্ন্যাসাশ্রমে সন্ন্যাসগুরু কর্তৃক প্রদত্ত নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীচৈতন্য নামেই তিনি জগদ্বিখ্যাত।

শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন অসামান্য মেধা ও অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী। অতি অল্প সময়েই তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার, পুরাণ, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন। কিশোর শ্রীচৈতন্য স্বগৃহে একটি টোল খুলে ছাত্রদের পড়াতে লাগলেন। তাঁর খুব সুনাম হল। কিছুদিন পরে তিনি পূর্ববঙ্গে ভ্রমণ করতে গেলেন। সেখানে লোক সকল তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হল ও বহু শিষ্য হল। পূর্ববঙ্গে ভ্রমণকালে নবদ্বীপে তাঁর সহধর্মিনী লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হয় সর্পাঘাতে। শ্রীচৈতন্য পূর্ববঙ্গ থেকে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে নবদ্বীপে গৃহে ফিরলেন। মাকে সান্ত্বনা দিলেন। কিছুদিন পরে মায়ের কথামতো সনাতন-কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের পুনরায় বিবাহ হয়।

কিছুকাল পরে শ্রীচৈতন্যদেব পিতৃক্রিয়ার্থ গয়ায় গমন করলেন। গয়ায় বিষ্ণুমন্দিরে ব্রাহ্মণদের স্তব, স্তুতি, পূজা প্রভৃতির দর্শনে ও শ্রবণে তাঁর হৃদয়ে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হল। সেখানে ব্রহ্মচারী বৈষ্ণব ঈশ্বরপুরীর নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিলেন।

গয়া থেকে নবজীবন লাভ করে শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে ফিরে এলেন। তিনি সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে কেবল শ্রীহরিনামে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর ভক্তি ও প্রেমে মুগ্ধ শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, বীরভূমের অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, নবদ্বীপের শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত এবং যশোহরের হরিভক্ত নামাচার্য যবন হরিদাস প্রমুখ বৈষ্ণবসহ অন্যান্যরা নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হলেন। বৈষ্ণব দর্শনে—বৈষ্ণবদেব কোনও ভেদ নেই। সকলেই সমান। নবদ্বীপের ঘরে ঘরে শুরু হলো শ্রীহরিনাম বিতরণের পালা।

সেই সময় নবদ্বীপে বাংলার মুসলমান সুলতান হুসেন শাহের স্থানীয় প্রতিনিধি ছিল চাঁদ কাজী। চাঁদ কাজী ছিল অত্যন্ত হিন্দুবিদ্বেষী। তার লোকজন শ্রীহরিনাম সংকীর্তনে বিঘ্ন সৃষ্টি করত, বাধা দিত। একদিন শ্রীহরিনামে মাতোয়ারা ভক্তরা কার্যত কাজীর বাড়ী আক্রমণ করল। তারা কাজীর বাগান তচনচ করে দিল। পরিস্থিতি

।। শ্রীচৈতন্যদেবের ৫২৫তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে প্রকাশিত।।

প্রতিকূল বুঝতে পেরে চাঁদ কাজী প্রকাশ্যে এসে জনসমক্ষে তার অপরাধ স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলো ও শ্রীচৈতন্যদেবে শরণ নিল। নবদ্বীপে প্রকাশ্যে শ্রীহরিনাম সংকীর্তনে আর বাধা থাকল না।

ত্যাগ ছাড়া সংঘ সংগঠিত হয় না। সংঘ ছাড়া শক্তি হয় না। সংঘশক্তি কলৌ যুগে। তিনি সম্যক ত্যাগ-সন্ন্যাসগ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তখন তাঁর বয়স চব্বিশ প্রায় পূর্ণ হবার পথে। তিনি গর্ভধারিণী জননী, সহধর্মিনী, নিত্যপার্ষদ ভক্ত সকলকে পরিত্যাগ করে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের এক হাড়হিমকরা শীতের রাত্রে নবদ্বীপ থেকে ধাবমান হলেন কাটোয়ার পথে। তিনি কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণনাম প্রচারের মাধ্যমে জীবের চৈতন্য জাগরণে মহাব্রতী —তাই তাঁর সন্ন্যাসগুরু কেশব ভারতী কর্তৃক তাঁর নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারতে ধর্মপ্রচারে মনস্থির করলেন। তিনি শ্রীজগন্নাথদেবকে প্রদক্ষিণ করে উদ্বাহু নৃত্যে জলদগম্ভীর সুমধুর কণ্ঠে শ্রীহরিনাম সংকীর্তনে আকাশ বাতাস বিমোহিত করে অগ্রসর হতে লাগলেন দাক্ষিণাত্যের পথে। সঙ্গী তাঁর কৌপীন, বহির্বাস ও জলপাত্র বহনকারী একান্ত অনুগত ভক্ত একমাত্র কৃষ্ণদাস। পথের লোক সকল শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করে ও তাঁর নামসংকীর্তন শ্রবণ করে হরি হরি বলে নৃত্য করতে লাগল। এইভাবে দাক্ষিণাত্যবাসীকে হরিভক্ত করে মহাপ্রভু আরও দক্ষিণে অগ্রসর হলেন।

পথে কূর্মক্ষেত্রে সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ বাসুদেব শ্রীচৈতন্যদেবের সাদর আলিঙ্গনে, গোদাবরী তীরে বিষয়ী রাজসেবী শুভ্র রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের আলোচনায়, রঙ্গনাথে দেবালয়ে নিত্য সাশ্রুনয়নে গীতাপাঠরত সরলপ্রাণ নিরক্ষর ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্যদেবের গভীর মহানুভবতায় ধন্য হয়ে গেল। শ্রীচৈতন্যদেব সেতুবন্ধে পৌঁছে ধনুতীর্থে স্নান করে রামেশ্বরে পূজা দিলেন।

রামেশ্বর থেকে শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে (পুরী) প্রত্যাগমন করে শ্রীবৃন্দাবন গমনকালে বাংলার রামকেলীতে গমন করলেন। তখন রামকেলীবাসী দবীর খাস ও সাকর মল্লিক নামে খ্যাত দুই সহোদর ভাই বাংলার সুলতান হুসেন শাহের রাজদরবারে কাজ করতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের গভীর প্রজ্ঞা, প্রেম ও ভক্তির প্রভাবে তাঁরা হুসেন শাহের রাজদরবার ও স্বগৃহ পরিত্যাগ করলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের নির্দেশে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করে লুপ্ততীর্থ উদ্ধারে ও সাহিত্যের মাধ্যমে ধর্ম প্রচারে নিযুক্ত হলেন। শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক দবীর খাস শ্রীরূপ গোস্বামী ও সাকর মল্লিক শ্রীসনাতন গোস্বামী নামে আখ্যায়িত হলেন।

মহাপ্রভু রামকেলী থেকে নীলাচলে (পুরুষোত্তম) প্রত্যাগমন করলেন। নীলাচলের ভক্তবৃন্দ পুনরায় তাঁকে পেয়ে আনন্দসাগরে ভাসল এবং সারা ভারত থেকে নদীরূপীভক্ত সাগররূপী শ্রীচৈতন্যদেবে মিলিত হবার জন্য ধাবমান হতে থাকল নীলাচলের পথে।

মুচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে
শুচি হয়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে।।

শ্রীচৈতন্যদেব এই দর্শনকে মূল ভিত্তি করে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, নিরক্ষর-সাক্ষর, পণ্ডিত-মূর্খ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য নির্বিশেষে সকল মানুষকে শ্রীহরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ করেছেন। হতদরিদ্র, বঞ্চি ত, নিপীড়িত, আশাহত, অপাংক্তেয়, অস্পৃশ্য, পতিত মানুষের জন্য তাঁর অন্তরের গভীরতম উৎস থেকে উৎসারিত স্বতস্ফূর্ত যে আবেগ, উদ্যম, উন্মাদনা, হাহাকার তার তুলনা হয় না। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরা তথা ধর্মের জন্য পক্ককেশা জননীর আদরভরা বাৎসল্য, সহধর্মিনীর সোহাগভরা আত্মদান, নদীয়া নগরবাসী প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরভরা প্রীতির আকর্ষণ, বিশ্ববিশ্রুত পাণ্ডিত্যের সৌরভ, বহু বিদ্যার্থী-মুখরিত চতুষ্পাঠীর গৌরব পরিত্যাগ করে এবং নবদ্বীপ থেকে পূর্ববঙ্গ, কাটোয়া থেকে নীলাচল, নীলাচল থেকে রামেশ্বর, নীলাচল থেকে রামকেলী, নীলাচল থেকে শ্রীবৃন্দাবন শ্রীহরিনাম সংকীর্তনে পদব্রজে পরিক্রমার মাধ্যমে কার্যত সারা ভারতে ধর্মপ্রচার করে পৃথিবীর জনজাগরণ তথা ধর্মজাগরণের ইতিহাসে এক বিরলতম অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ চিরস্থাপন করেছেন। ধর্ম তথা রাষ্ট্রের জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধন তুলনারহিত। শ্রীচৈতন্যদেব যুগধর্ম বৈষ্ণবধর্মের মাধ্যমে চিরন্তনী সনাতন হিন্দুধর্মই প্রচার করেছেন। তিনি হিন্দুধর্মের বস্তুত রক্ষক, সংস্কারক ও সম্প্রসারক।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত এই মহানাম বিশ্বে সর্বাধিক সুরে ও তালে গীত এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় ভক্তিসংগীত। পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নেই যেখানে এই ভক্তিসংগীত গীত হয় না। ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর সম্বলিত এই বিশ্বসংগীত বাস্তবিকই এক মহামন্ত্র। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

পাঁচশ বছরের স্মৃতি বিজড়িত কল্যাণীর কৃষ্ণরাই মন্দির

পায়েল বাগচী ঃ নদীয়া ॥ সংস্কারের অভাবে ঐতিহ্য হারাচ্ছে নদীয়া জেলার কল্যাণীর স্মৃতি বিজড়িত ৫০০ বছরের অধিক প্রাচীন কৃষ্ণরাই মন্দির। মন্দিরের গায়ে খোদিত গান্ধার শিল্পরীতির নকশার মতো প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার নির্দশন নষ্ট হতে বসেছে বলে বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন। মন্দিরের প্রবেশের পথে সিংহ-দরজা। তার দুপাশে বসবার বেদীগুলো জীর্ণ দশায় পরিণত।

অতীতের কাঞ্চ নপল্লী আজকের নদীয়ার কল্যাণী মহকুমার গ্রাম-কাঁচরাপাড়া। ১৭৮৫ সালে কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার নিমাইচরণ মল্লিক ও গৌরীচরণ মল্লিক দক্ষিণমুখী ৩৯টি চালার মন্দিরটি এখানে নির্মাণ করেছিলেন। কথিত আছে মহাপ্রভু-চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ শিবানন্দ সেন কর্তৃক মন্দিরের বর্তমান কৃষ্ণরাই মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত। স্বপ্নাদিষ্ট হবার পর তিনি ভাগীরথী নদীর গর্ভে একটি কালো কষ্ঠিপাথর পান এবং সেটি খোদাই করে কৃষ্ণমূর্তি নির্মাণ করেন। আরও জানা গেছে, বণিক ব্যবসায়ী মল্লিক পরিবারের তৎকালীন বংশধর একবার বাণিজ্য করতে যাওয়ার সময় শুভকামনা করেছিলেন এবং ফেরার সময় মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায় রথতলায় তিনি একটি মন্দির স্থাপন করেন। ৬০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট মন্দিরটি দৈর্ঘ ও প্রস্থে যথাক্রমে প্রায় ৫০ ও ৩৪ ফুট। এছাড়া মন্দিরের গায়ে পোড়া মাটির ৬৬টি পদ্ম খোদাই করা আছে। এক প্রবীণ বাসিন্দা জানান, যশোরের রাজা বারোভুঁইয়াদের অন্যতম প্রবীণ মহারাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত পুত্র ছিলেন কচুরায়। প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মোঘল সম্রাটের নিকট নালিশ জানাতে যাওয়ার সময়
তিনি কাঞ্চ নপল্লীর এই মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করেছিলেন। স্থানীয় মানুষ-জনের অভিযোগ, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মন্দিরের গা থেকে চুন-বালি-খসে পড়ছে। মন্দিরে প্রবেশের দু'পাশের দর্শনার্থীদের বিশ্রামাগারও ভগ্নদশায় পরিণত। নির্জন পরিবেশ থাকায় সমাজবিরোধীদের মুক্তাঞ্চ লে পরিণত হচ্ছে বর্তমান মন্দির চত্বর। দিবারাত্র মন্দির চত্বরে বসছে তাসাড়ুদের আড্ডা। মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর অভিযোগ, সংস্কারের ব্যাপারে পুরাতত্ত্ব বিভাগকে বহুবার জানিয়েও কোনও ফল মেলেনি। সরকারি উদাসীনতায় ধ্বংসের পথে এই ঐতিহাসিক পীঠস্থান।
দেখভালের দায়িত্বে থাকা দুর্গারানী মুখার্জী জানান, প্রতিদিন বিগ্রহকে স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্র পরিধান করার রীতি আজও প্রচলিত। বর্তমানে জাঁকজমক করে দোল উৎসব হয় না, শুধু নিয়মরক্ষার খাতিরেই হয়। এছাড়া প্রতি বছর মন্দির প্রাঙ্গণে আষাঢ় মাসে রথের মেলা বসে। এদিকে পঞ্চ ায়েত সূত্রে খবর, মুখার্জী পরিবারের অংশীদারেরা এবং সেবাইতেরা সংস্কারের ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত পঞ্চ ায়েতের দ্বারস্থ হননি। ওনাদের সদিচ্ছা থাকলেই পঞ্চ ায়েত সংস্কারের কাজে উদ্যোগী হবে। কিন্তু এইভাবে আর কতদিন চলবে? দুই পক্ষের 'Tag of war-এ হারাতে বসেছে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কার।

বোধকথা

নারীমাত্রই মাতৃবৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ নারী মাত্রই জগৎজননী মা দুর্গার অংশস্বরূপা। এরকমই বিশ্বাস এদেশের আপামর হিন্দু সমাজের। আর সে জন্যই ছোট-ছোট মেয়েদেরকে 'মা' বলে সম্বোধন করার প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত। কাকীমা, মাসীমা, জেঠিমা, পিসিমা, মামীমা, সবাই 'মা'। নববিবাহিতা বধূও বৌ-মা।

একবার এক ভক্ত ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করে বসল, "মহারাজ, আপনি বিবাহ করেছেন। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনযাপন করেন না কেন?" একথা শুনে ঠাকুর তাকে বললেন, 'তোমাকে একটা গল্প বলি শোন।

একবার কার্তিক বালকসুলভ চাপল্যবশত এক বিড়ালকে খামচে দেন। খেলতে খেলতে খেলাচ্ছলে হয়ে গেছে। খেলা শেষ করে কার্তিক ঘরে ফিরে দেখে, মা দুর্গার গালে নখের আঁচড়ের দাগ ফুটে বের হয়েছে। দেখে তো কার্তিক খুবই আশ্চর্য। তখন কার্তিক মা পার্বতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, মা, তোমার গালে এটা কিসের দাগ?

কে আচড়ে দিল? কি করে হলো? পার্বতী বললেন, বাছা, এতো তোমার জন্যই হয়েছে। কার্তিক বলল, আমি তো তোমাকে কখনও নখ দিয়ে আঁচড়াইনি।

মা বললেন, তুমি কি বিড়ালকে আঁচড়ে দাওনি? কার্তিক বলল, হ্যাঁ, তা দিয়েছি। ওর দাগ তোমার গালে এল কীভাবে? পার্বতী বললেন, বাছা, জগৎ সংসারে যত নারী-রূপ আছে আমি তাদের সবার মধ্যে আছি। তুমি যদি যেকোনও নারীকে কষ্ট দাও তা আমাকেই কষ্ট দেওয়া হবে। এটা মনে রাখবে।

একথা শোনার পর কার্তিক তো অবাক্ হয়ে গেল। কার্তিক বুঝতে পারল জগতের সকল নারী জাতিই তার মায়ের সমান। তখনই কার্তিক প্রতিজ্ঞা করল—বিবাহ করবে না, কেননা, কাকে বিয়ে করবে? জগতের সব মেয়েরাই মায়ের সমান। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবার হেসে বললেন, কার্তিকের মতোই জগতের সকল স্ত্রীলোকই আমার 'মা'। এজন্যই গৃহস্থ জীবনযাপন করিনি।

।। চিত্রকথা ।। শ্রীলঙ্কার উৎপত্তি।। ৪

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর।।

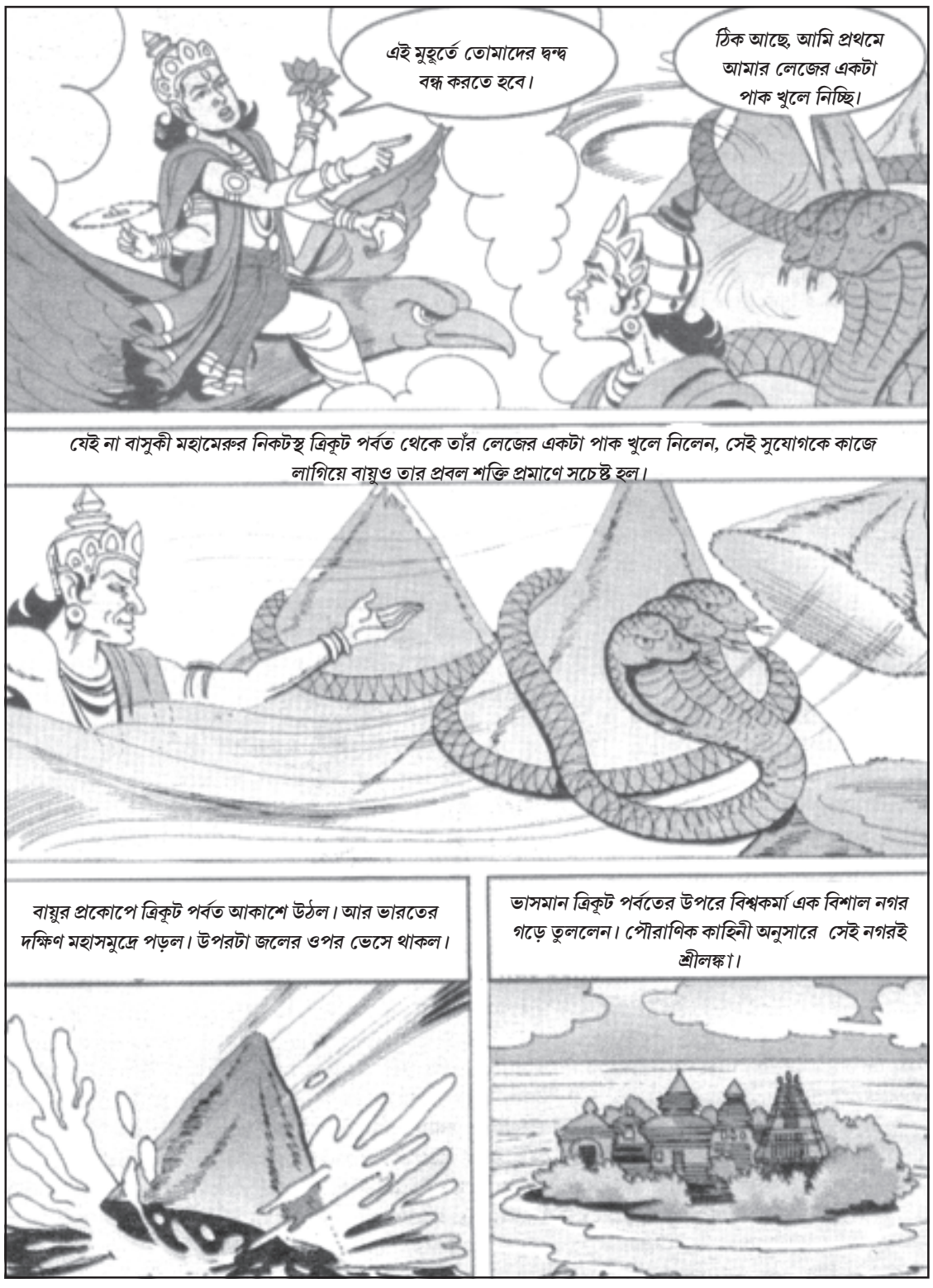

রোগ নির্ণয়ে জিন বিশ্লেষণ

জিন বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, রোগ হওয়ার আগে রোগের আশঙ্কাই যদি নির্মূল করা যায়, তাহলে মানুষকে আরও বেশি সুরক্ষিত রাখা সম্ভব। অর্থাৎ মানুষের জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই যদি তার জেনেটিক গঠনের বিশদ বিশ্লেষণ পাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে সেই শিশুর কী কী রোগ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। ফলে জিনগত রোগের সম্ভাবনা থাকলে সোমাটিক জিন-থেরাপির মাধ্যমে সেই রোগ দ্রুত নির্মূল করা যাবে। আর, সেই দিন বেশি দূরে নয়, যেদিন শিশুর জন্মের পর হাসপাতাল বা নার্সিংহোম থেকেই চিকিৎসকেরা একটা সিডিতে ওই শিশুর ক্রোমোজোম অ্যানালিসিসের ডিটেল রিপোর্ট দিয়ে দেবেন।

তড়িৎ প্রয়োগে ক্যান্সার চিকিৎসা

ইলেকট্রিক ফিল্ডের সাহায্যে চিকিৎসার আরও গুরুত্বপূর্ণ দিক আবিষ্কৃত হয়েছে সাম্প্রতিককালে। গবেষণা সংস্থা 'নোভোকিওর' চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, মস্তিষ্কের ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীকে মাত্র দু'টি ইলেকট্রোডের সাহায্যে চিকিৎসা করা সম্ভব। যে-কোনও ক্যান্সারাস টিউমারের উপর ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করে, ওই আক্রান্ত কোষগুলোকে প্যারালাইজ করে দেওয়া যায়। যার ফলে কোষ বিভাজন বন্ধ হয়ে গিয়ে ক্যান্সার আর ছড়ায় না।

চুম্বনে জীবাণু বিনিময়

ভালবাসা বা নানারকম সামাজিক সৌজন্য বিনিময়ের জন্যেও চুম্বনের প্রথা রয়েছে নানা দেশে। কিন্তু তা কখনও ক্ষতিকারকও হতে পারে। কোনও কোনও মানুষের লালায় থাকে 'সাইটোমেগালো ভাইরাস', যার নাম দেওয়া হয়েছে 'লাভ বাগ'। এই ভাইরাসের সংক্রমণ মানুষের শরীরে কিছু ক্ষতিকর 'প্যাথোজেন' প্রবেশ করিয়ে দেয়, যা সৃষ্টি করে পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন রোগ। তবে এই ভাইরাস সবচেয়ে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে গর্ভস্থ ভ্রূণের—এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা। চুম্বনে হৃদয়াবেগ বিনিময় হোক বা না-হোক, জীবাণু বিনিময় কিন্তু হতেই পারে।

গ্রীষ্মে সৌর-টুপি

গরমে মাথা ঠান্ডা রাখতে প্রযুক্তিবিদেরা এক অভিনব টুপি আবিষ্কার করেছেন। ওই টুপির মাথায় একেবারে উপরে আছে সৌর ব্যাটারি-প্যানেল, যা সৌরশক্তি সংগ্রহ করে টুপির মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে মাথা ঠান্ডা রাখবে। টুপির ঠাটে আছে ছোট্ট একটি পাখাও, যা বিভিন্ন দিকে ঘুরতে পারে। পুরোটাই চলবে সৌর-ব্যাটারির সাহায্যে।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

—বাজারে মাছের আকাল দেখলেন?
—আর বলবেন না, মরে গেলেও ওরা নিজেদের দাম কমায় না।

* * *

ডাক্তার (কম্পাউন্ডারকে)—এখন কোনও রোগীকে পাঠাবে না।
কম্পাউন্ডার (কিছুক্ষণ পর)—স্যার, একজন জীবনমরণ সমস্যা নিয়ে এসেছেন।
ডাক্তার—ঠিক আছে, পাঠাও।
ডাক্তার (আগন্তুককে দেখে)—কেসটা কী?
আগন্তুক—আজ্ঞে, আমি জীবন-বিমার দালাল।

* * *

এক ভদ্রলোক বড় একটা মাছ ঝুলিয়ে চলেছেন। এক উৎসুক পথচারী জিজ্ঞেস করলেন, 'কত পড়ল দাদা?'
—আশি।
—তা আসুন, কিন্তু দামটা বললে কী এমন ক্ষতি হোত!

* * *

সাহেব (এক ভারতীয়কে ব্যঙ্গ করে) —তোমরা বড় অদ্ভুত জাতি। কেউ সাদা, কেউ বাদামি, কেউ বা আবার ঘোড়ার মতো কালো।
ভারতীয় (শান্ত গলায়)—যা বলেছ সাহেব, ঘোড়াদের গায়ের রঙ নানারকম হয়, কিন্তু গাধাদের সবার রঙ এক।

* * *

দিয়া ঃ বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে।
রিয়া ঃ সে কী, তুই তো বাড়িতেই আছিস!
দিয়া ঃ সেজন্যেই তো মন খারাপ!

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। কোন্ বাংলা উপন্যাস প্রথম 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার লাভ করে?—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি/সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'/তারাশঙ্করের 'গণদেবতা'।

২। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সংবিধান ভারতের। ছোট সংবিধান?

৩। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তম রাজ্য অরুণাচল—ঠিক না ভুল।

৪। ওয়াল্ট ডিজনির বিখ্যাত কার্টুন-চরিত্র একটি হরিণ। তার নাম কী?

৫। ডাইনোসর শব্দের 'সর' কথাটির মানে কী?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ
১। তারাশঙ্করের গণদেবতা
২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের
৩। ঠিক
৪। ব্যাম্বি
৫। সরীসৃপ

মঞ্চে বাঁদিক থেকে শ্যামল হাতি, তুষার মজুমদার, জয়রথ শেঠী এবং কে জে রাও। ছবি ঃ শিবু ঘোষ

বিজয়া ব্যাঙ্কের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ক্ষুদ্র উদ্যোগের বিকেন্দ্রিকরণ, সর্বোপরি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে কাজ করার কথা বি এম এস বলে এসেছে। আজ তার প্রাসঙ্গিকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে মন্তব্য করলেন বি এম এস-এর প্রাক্তন প্রবীণ কার্যকর্তা তথা এল আই সির প্রাক্তন উচ্চপদাধিকারী তুষার মজুমদার। গত ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বিজয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে তিনি এই মন্তব্য করেন।

ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন নেতাজী সুভাষ রোডস্থিত ব্রাঞ্চের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার বি জয়রাম শেঠী এবং ব্র্যাবোন রোড ব্রাঞ্চের কে জে রাও।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে এসে বিজয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েসনের রিজিওনাল সেক্রেটারি শ্যামল হাতি বলেন, সংস্কৃতির প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ তাই হলো আমাদের কাজের প্রেরণা। এই প্রেরণা থেকেই দেশ ও সমাজের নানা সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে ইউনিয়নের কর্মীরা এগিয়ে এসেছেন বলে শ্রী হাতি মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়পর্বে দেবারতি মুখার্জী এবং ইন্দ্রানী সেন সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত শ্যামল রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ত্রিপুরা বিজেপি-র রাজ্য কোষাধ্যক্ষ শ্যামল রায় (৪৬) গত ১৫ ফেব্রুয়ারি এক মর্মান্তিক ট্রেনে দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। ত্রিপুরা থেকে ইন্দোরে বিজেপির জাতীয় সম্মেলনে তিনি যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। এদিন দুপুরে বালি স্টেশনের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্রেনের চাকায় তাঁর দেহ ছিন্নছিন্ন হয়ে যায়। কী করে তিনি ট্রেন থেকে পড়ে গেলেন তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে রেল পুলিশ জানিয়েছে।

শ্যামল রায়

শ্যামলবাবুর সঙ্গী, ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি নীলমণি দেব বলেন, "শ্যামলবাবু ও তাঁর স্ত্রীসহ আমরা মোট আটজন দলের জাতীয় সম্মেলনে যোগ দিতে ইন্দোর যাচ্ছিলাম। এদিন দুপুর ১.২৫ নাগাদ হাওড়া-ভোপাল এক্সপ্রেসে আমাদের টিকিট কাটা ছিল। সেইমতো দমদম বিমানবন্দরে নেমে ট্যাক্সির জন্য প্রিপেড কাউন্টারে যাই। কাউন্টারের লোকজন আমাদের পরামর্শ দেন, চটপট হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাতে হলে বালি হয়েই যাওয়া ভালো।

এরপর আমরা দু'টো ট্যাক্সিতে চেপে দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ বালি স্টেশনে পৌঁছাই। লোকালে তখন ভালোই ভিড়। আমাদের প্রত্যেকের কাঁধে একটি ব্যাগ ছিল। মেয়েরা মহিলা কামরায় ওঠেন। আর আমরা ঠিক তার আগের কামরায় উঠি। ভিড়ের চোটে শ্যামল কোনও রকমে হাতল ধরে গেটের কাছেই দাঁড়ায়। ওর ব্যাগটির সঙ্গে ধাক্কা লাগে এবং টাল সামলাতে না পেরে শ্যামল পড়ে যায়। নীলমণিবাবু আরও বলেন, আমরা ট্রেনটি দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বালি স্টেশন ছাড়ার পর ট্রেনটি আর কোথাও দাঁড়ায়নি। অন্যান্য যাত্রীরা বলেন, এটা গ্যালপিং। হাওড়ায় এসে জি আর পি-তে খবর দিই।" জি আর পি সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্যামল রায়ের দেহের ছিন্নভিন্ন টুকরো লাইনের এধারে-ওধারে পড়েছিল। আবার মাথাসহ ধড়ের কিছুটা অংশ আটকে ছিল ট্রেনের গায়ে। হাওড়া স্টেশনের পুলিশ কর্মীরা সেসব উদ্ধার করেন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি-র সভাপতি রাহুল সিংহ, সংগঠন সম্পাদক অমল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ হাওড়া স্টেশনে যান। নীলমণিবাবু বলেন, শ্যামল আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী। ইন্দোর যাওয়ার সফর তারা বাতিল করেছেন। শ্যামলবাবুর দেহাংশ কফিন বন্দি করে বিমানে আগরতলায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি-র সংগঠন সম্পাদক সুন্দর পাল তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মীকে হারালেন বলে শোকপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন, শ্যামলদা ছিলেন একজন সৎ ও সক্রিয় কর্মী।

দিব্যভাব প্রচারে দিব্যানন্দ মিশনের প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সমাজের মধ্যে মূল্যবোধের জাগরণ ঘটাতে এক সদর্থক ভূমিকা নিতে চলেছে দিব্যানন্দ মিশন। সম্প্রতি দিব্যানন্দ মিশনের পক্ষ থেকে ট্রাস্টির সভাপতি কে কে ভৌমিক এবং সহসভাপতি বি হরি যৌথ বিবৃতিতে জানান— পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও ক্লাব বা সংস্থা জায়গা দিলে তারা আলোচনা সাপেক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি দিব্যানন্দ মিশন ট্রাস্টির পক্ষ থেকে বসিয়ে দেবেন। এ উদ্যোগ বর্তমান তরুণ সমাজের মানসিক অবক্ষয়ের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করবে, তাই এই ধরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তারা জানান।

এছাড়া স্বামীজীর বাণী ও রচনা নিয়ে যুবসমাজের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এই ভাব বিস্তারের কার্যক্রমও ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে বলে তারা জানান।

বঙ্গীয় শিক্ষক সংঘের নবগঠিত কমিটি

সংবাদদাতা ॥ বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংঘের রাজ্য সম্মেলনে (১৯-২০ ডিসেম্বর, ২০০৯) আগামী দুই বছরের জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠিত হয়েছে।

উপদেষ্টামন্ডলী ঃ রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যনারায়ণ মজুমদার, অতুল চন্দ্র বিশ্বাস, জগদীশ প্রসাদ, নির্মলেন্দু চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্রলাল ব্যানার্জী।

সভাপতি ঃ অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ সভাপতি ঃ পঙ্কজ নিয়োগী, নবকুমার রায়, মানস বসু রায়, আলোক দাস, ঠাকুরদাস অধিকারী।

সাধারণ সম্পাদক ঃ অরুপ সেনগুপ্ত।

সংগঠন সম্পাদক ঃ নারায়ণ চন্দ্র পাল।

যুগ্ম সম্পাদক ঃ অবনীভূষণ মন্ডল, বিষ্ণুপদ রায়।

সহকারী সম্পাদক ঃ বিমলেন্দু দাস, গৌরহরি চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য্য, গৌতম পাল।

কোষাধ্যক্ষ ঃ গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহকারী কোষাধ্যক্ষ ঃ বিশ্বনাথ পাল (দক্ষিণ দিনাজপুর)।

হিসাব রক্ষক ঃ তারাপদ মাকুর।

পত্রিকা ও প্রকাশনা সম্পাদক ঃ মিহির ব্যানার্জী, জয়ন্ত রায়চৌধুরী।

কার্যকারিণী সদস্য ঃ রনজিৎ সাহা (জলপাইগুড়ি), তরুণ চক্রবর্তী (কুচবিহার), সুনীল মিত্র (বর্ধমান), রাম বসাক (দক্ষিণ দিনাজপুর), অসিত দে (পুরুলিয়া), চিত্ত চ্যাটার্জী (জেঠিয়া), শুভঙ্কর রায় (হাবড়া), দুর্গা রায়চৌধুরী (মুর্শিদাবাদ), তপন মন্ডল (বর্ধমান), বিদ্যুৎ

সমাবেশ সমাচার

মৈত্র (নদীয়া), ঋত্বিক রাহা (কলকাতা), তুষার মাইতি (ভাটপাড়া), সমীরণ রায় (হাওড়া)।

মঙ্গল নিধি

গত ৪ ফেব্রুয়ারি মালদা শহরের স্বয়ংসেবক এবং বিশিষ্ট আয়ুর্বেদ চিকিৎসক রবিরঞ্জন দাস, তাঁর কন্যা শর্মিষ্ঠার সঙ্গে সমর্পণ দাসের বিয়েতে হিন্দু-সমাজের সেবা কাজের জন্য ৫০০ টাকা আর এস এসের মালদা জেলা সঙ্ঘচালক সুব্রত কুণ্ডুর হাতে তুলে দেন। বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের প্রান্ত কার্যবাহ বিদ্রোহী সরকার, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের সভাপতি মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য স্বয়ংসেবকরা।

শোক সংবাদ

বারুইপুরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী সুশান্ত কুমার সরকার গত ৪ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বৎসর। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সুন্দরবন জেলার (দক্ষিণ ২৪ পরগণা) বারুইপুর নগর সঙ্ঘচালক ইন্দ্রজিৎ সরকার তাঁর পুত্র। আদর্শবাদী মানুষ হিসাবে সুশান্তবাবু স্থানীয় মানুষের কাছে সুপরিচিত ছিলেন।

❁ ❁ ❁

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তপন ঘোষের মাতৃদেবী অনিমা ঘোষ গত ৭ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বৎসর। তিনি এক পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গিয়েছেন।

❁ ❁ ❁

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদা জেলা সহ-সম্পর্ক প্রমুখ শঙ্কর চৌধুরীর মাতৃদেবী সুশীলা চৌধুরী দীর্ঘ রোগ-ভোগের পর গত ১৫ জানুয়ারি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি ৭ পুত্র ২ কন্যা সহ নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

❁ ❁ ❁

হাওড়া জেলায় সঙ্ঘের বেলডুবি মন্ডল কার্যবাহ বিজয় সর্দারের মা কনক সর্দার গত ২৪ জানুয়ারি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। তিনি তিন পুত্র ও তিন কন্যাকে রেখে গেছেন।

❁ ❁ ❁

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের বসিরহাট জেলার গাছা শাখার স্বয়ংসেবক অমল ঘোষ-এর পিতা মনোরঞ্জন ঘোষ গত ২৫ জানুয়ারি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ৩ পুত্র, কন্যা ও পরিবার-পরিজনদের রেখে গেছেন।

❁ ❁ ❁

পশ্চিম কোচবিহার জেলার মাথা-ভাঙ্গা নিবাসী সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক মনোরঞ্জন সরকারের পিতৃদেব বটেশ্বর সরকার গত ১৫ জানুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৪ বছর। তাঁর বংশানুক্রমিক পাঁচ পুরুষ সহযোগে তিন ছেলে পাঁচ মেয়ে সহ প্রায় একশোজন নাতি-নাতনি বর্তমান।

❁ ❁ ❁

পশ্চিম কোচবিহার জেলার সিতাই মহকুমার বৌদ্ধিক প্রমুখ অমলেন্দু রায়ের মাতৃদেবী বালিকা রায় ৬৫ বছর বয়সে গত ৩ জানুয়ারি পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে স্বামীসহ চারপুত্র, তিন কন্যা এবং নাতি নাতনিদের রেখে গিয়েছেন।

শব্দরূপ - ৫৩৭

বাবলি সরকার

■	■	১	২			৩	■
■	■	■		■	■		■
৪	৫	■	৬		৭		
■	৮	৯		■		■	■
■	■		■	১০		১১	■
১২	১৩				■	১৪	
■		■	■		■	■	■
■	১৫					■	■

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. স্থানিক পরিচয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের এক নাম, শেষ দুয়ে চন্দ্র, ৪. হিন্দুদের মহাতীর্থস্থান, বারাণসী, ৬. দুরভিসন্ধি, প্রথম ঘরে মন্দ, শেষ দুয়ে রাম তনয়, ৮. প্রতিশব্দে কুঠার, কুড়ুল, শেষ দুয়ে শক্তি, ১০. অঙ্কশাস্ত্র, ১২. নাগমাতার আরাধনা, ১৪. প্রবাল, ১৫. বিশেষণে ভাবনা জন্মায় এমন।

উপর-নীচ ঃ ২. মন্দির, দেবালয়, দেবগণ, ৩. বিশেষণে কৃপাময়, সদয়, আগাগোড়া পাতা, ৫. বসন্ত ঋতুর আগের ঋতু, ৭. তৎসম শব্দে নৌকা, প্রথম দুয়ে দেরি, ৯. তৎসম শব্দে তর্কাতর্কি, একে-তিনে চর্বি, ১০. হাতির মতো মুখ তাই গণেশের এই নাম, ১১. কোনও সংকল্প সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কঠোর সাধনা, ১৩. ইন্দ্রের হাতে নিহত অসুরবিশেষ, শেষ দুয়ে চর্মকার।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৩৫

সঠিক উত্তরদাতা

শান্তনু গুড়িয়া
বেড়াবেড়িয়া, বাগনান,
হাওড়া-৭১১৩০৩
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭০০০০৯
সুনীল বিষ্ণু, সিউড়ি, বীরভূম

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

■	■	হ	রি	হ	র	■	চা
বা	উ	ল	■	■	সু	■	টা
■	প	■	■	■	ল	খা	ই
ন	নি	চো	রা	■	■	গু	■
■	ষ	■	■	স	ঞ্জী	ব	নী
ম	দ	ন	■	■	■	দা	■
ন্দি	■	ন্দ	■	■	ম	হ	ল
র	■	ন	ম	স্কা	র	■	■

● ৫৩৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ৮ মার্চ, ২০১০ সংখ্যায়

ছত্রপতি শিবাজীর জীবন নিয়ে সংস্কার ভারতীর নাটক 'রাজযোগী'

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন নাটকে লোকশিক্ষা হয়। নাটক তাই শুধুমাত্র বিনোদনের পসরা নয়। ইদানীং বেশকিছু ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে গ্রুপ থিয়েটার মঞ্চে নাটক হচ্ছে। সাজাহান, সিরাজদ্দৌল্লা তো প্রায়ই হয়। অতি সম্প্রতি আওরঙ্গজেব নাটকটিও মঞ্চ স্থ হচ্ছে। এই সমস্ত চরিত্র কি আমাদের আদর্শ? ধর্ম ও স্বদেশকে মহীয়ান করার কাজে এদের কি কোনও অবদান আছে? কিন্তু নিজেদের সেকুলার সাজাতে কিছু নাট্যদল বেছে নিয়েছেন এই সব নাটক। এঁরা বোধকরি গুরুগোবিন্দ সিংহ, রাণা প্রতাপ, শিবাজী, রণজিৎ সিং—এঁদের নাম শোনেননি।

'রাজযোগী' নাটকের একটি দৃশ্য।

এরই মাঝে সংস্কার ভারতী সম্প্রতি মারাঠাবীর ছত্রপতি শিবাজীর জীবন নিয়ে নাটক 'রাজযোগী' মঞ্চ স্থ করে চলেছে। কলকাতা ও হাওড়ায় বেশকিছু অভিনয়ও হয়ে গেছে। সম্প্রতি অ্যাকাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস মঞ্চে নাটকটি দেখার সুযোগ হ'ল। মারাঠাবীর রাজা শিবাজী ছিলেন এই দেশের এক উজ্জ্বল চরিত্র। মুষ্টিমেয় মাওলা সেনাদের নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী মুঘল সম্রাটকে তিনি বারবার পর্যুদস্ত করেছেন। সরল মাওলা প্রজাদের অস্পৃশ্য বলে দূরে সরিয়ে না রেখে মা ভবানীর মন্দিরে তাদের প্রবেশের অধিকার দিয়েছেন। বিজাপুরের সাতশত মুসলমান সেনাদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ভুলে নিজ রাজ্যে আশ্রয় দিয়েছেন। কল্যাণ জয় করে তাঁর সেনাপতি বিশ্বনাথ পরাজিত মুলানা আহম্মদের পুত্রবধূকে শিবাজীকে উপঢৌকন দেওয়ার জন্য রাজসভায় নিয়ে আসায় মর্মাহত শিবাজী তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। অত্যন্ত কুশলী কূটনৈতিকের মতো মোঘলসম্রাট প্রেরিত শায়েস্তা খাঁ আর আফজল খাঁকে পরাস্ত করে নাস্তানাবুদ করেন। আর এই সমস্ত কাজে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁর মা জিজাবাঈ। ছত্রপতি শিবাজীর জীবনের এই সমস্ত ঘটনা নিয়েই নির্মিত হয়েছে সংস্কার ভারতীর সাম্প্রতিক নাটক 'রাজযোগী'। নাটক ও সামগ্রিক পরিকল্পনা বিকাশ ভট্টাচার্যের। 'রাজযোগী' শচীন সেনগুপ্তের কালজয়ী নাটক 'গৈরিক পতাকা'র অনুপ্রেরণায় রচিত হয়েছে।

১৯৩০-এর ১০ জুলাই কলকাতার অধুনালুপ্ত মনোমোহন থিয়েটারে গৈরিক পতাকা প্রথম মঞ্চ স্থ হয়। কমল মিত্র শিবাজীর চরিত্রে এবং সরযূবালা জিজাবাঈ-এর চরিত্রে অভিনয় করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। একই নাটকের সপ্তাহে চারদিন অভিনয়ের প্রথম গৌরব বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে 'গৈরিক পতাকার'ই প্রাপ্য। পরাধীন ভারতে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে শিবাজীর সংগ্রাম দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সেদিন উদ্বুদ্ধ করেছিল। স্বভাবতই বৃটিশ রাজশক্তি এই নাটক নিষিদ্ধ করে।

রঙ্গম

নির্দেশক দেবাশিস্ কবিরাজ মূলত দলগত অভিনয়ের ওপরই বেশী জোর দিয়েছেন। তবু জিজাবাঈ-এর চরিত্রাভিনেত্রী সান্ত্বনা চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। রামদাস স্বামীর ভূমিকাভিনেতা প্রদীপ দাসের কণ্ঠস্বরটি ভরাট ও আবেগসমৃদ্ধ। শিবাজীর চরিত্রে বিদ্যুৎ সরকার ভাল। অন্যান্যদের মধ্যে শ্রাবণী হালদার, সুকুমার পর্বত, অজিত আচার্য, শুভঙ্কর মুখার্জী, শুভেন্দু দত্ত, ঋতম ঘোষ, দীপঙ্কর ব্যানার্জী, সুমন্ত লাহা যথাযথ। আদিলশাহ ও এক পথচারীর ভূমিকায় যথাক্রমে গৌতম ঘোষ ও ভরত কুণ্ডুর অভিনয় চোখে পড়ে। আলো উত্তম বিশ্বাস। সাজসজ্জায় রূপান্তর-এর কাজ ভাল।

স্বল্পদৈর্ঘের এই নাটকের আগে ছিল এক অনবদ্য অনুষ্ঠান 'রবীন্দ্রনাথের নাটকের গান'। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকের বৈচিত্র্যময় চোদ্দটি গান পরিবেশন করেন যথাক্রমে লিপিকা হালদার ও বেহালার শিল্পীবৃন্দ, পার্থসারথী চৌধুরী (সোনারপুর), সবিতা দত্ত (বাগুইহাটি), সুপ্রীতি ঘোষ (উঃ কলকাতা), প্রবীর দাস (সিউড়ি), তনুশ্রী মল্লিক ও দেবরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (দক্ষিণ হাওড়া)।

সংস্কার ভারতীর নাট্যোৎসব

সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় বহুভাষিক নাট্যোৎসব এ বছর ২৫, ২৬ ও ২৭শে ডিসেম্বর '০৯ মহারাষ্ট্রের কোলাপুর শহরে অনুষ্ঠিত হ'ল। দিল্লী, মুম্বাই, পুণা, জামসেদপুর, বোলাঙ্গির, ব্যাঙ্গালোর, সিকিম ও জম্মু প্রভৃতি ১৩টি বিভিন্ন শহর থেকে মোট ১৩টি নাটক উৎসবে মঞ্চ স্থ হয়। উপস্থিত ছিলেন মোট ২৪০ জন নাট্যশিল্পী। প্রথমদিন বিভিন্ন প্রদেশের নিজস্ব বেশভূষায় সজ্জি হয়ে শিল্পীরা কোলাপুর নগর পরিক্রমা করে। এই নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত নির্দেশক ও অভিনেতা অমল পালেকার।

চীনের আসল রূপ

(৪ পাতার পর)

যে তাঁরা চৈনিক (Chinese)। আর এটাও বলার অপেক্ষা রাখে না যে তিব্বতীরা এই কথা কোনও কালে স্বীকার করবেন না যে তাঁরা জাতিতে চৈনিক। যাঁরা তিব্বতের ইতিহাস নিয়ে এতটুকুও নাড়াচাড়া করেছেন তাঁরা জানেন যে তিব্বত কখনই চীনের অঙ্গ ছিল না। তাঁরা সম্পূর্ণ আলাদা জাতি। ওঁদের নিজস্ব ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি, যা চীনের অঙ্গীভূত ছিল না। ১৭২০ সালে চীনের মানচু রাজাদের সময় প্রথমবার চীন তিব্বত অধিকার করে। কিন্তু ৫০ বছর পরে তাঁরা তিব্বতে সৈন্যবল না রেখে একজন "আম্মান"কে কিছু সৈন্য দিয়ে লাসাতে (Lhasa) রাখতেন।

কিন্তু ইতিহাসে এ কথাও জানা যায় যে অষ্টম শতাব্দী নাগাদ তিব্বতের পরাক্রমী রাজা শ্রোংগ-গান-গ্যাম্বো (Srong-Tsan-Gambo) বোধহয় ৬৪০ খৃস্টাব্দে চীনের সম্রাটকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁর রাজকুমারীকে পত্নী বলে গ্রহণ করেন (নেপালের অল্প সময়ের জন্য মহারাজাধিরাজ অংশুবর্মন (Amshuvarman) এর পুত্রী (?) ভ্রিকূটীদেবীও (Bhrikuti Devi) তাঁর পত্নী ছিলেন। এই দুই মহারাণীর উদ্যোগে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হয় ও এই ধর্ম তিব্বতে প্রাধান্য পায়।)

ইতিহাসে এও পাওয়া যায় এই রাজার পৌত্র Ti-Srong-de-tsan ৭৬৩ সালে তখনকার চীনের রাজধানী চানগান বা সিয়াফু (Changan or Hsia-Fu)-কে কুক্ষিগত করেছিলেন। (Lhasa-I by Parceval Landon, Special Correspondent of the Times, London. বইটি প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালের পয়লা জানুয়ারি)।

কাজেই দেখা যায় যে তিব্বতও চীনের কিছু অংশ অধিকার করেছিল। সে দেশের রাজধানীকেও ধ্বংস করেছিল। কাজেই তিব্বত কখনও চীনের দাসত্ব করেনি, চীনের অংশও ছিল না। কেবল ১৭২০ সাল থেকে মানচু বংশের রাজত্ব ছিল কিছুদিনের জন্য।

তিব্বতীর সেই মানচু বংশের রাজত্ব ২৯১২/১৩ নাগাদ শেষ করে দেয় ও যে সমস্ত সৈন্যরা ১৯১০-১১ নাগাদ আবার তিব্বতে হানা দেয়, তাদের শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে ভারতবর্ষের রাস্তা দিয়ে ফিরতে বাধ্য করে।

তারপর ১৯১৩ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত তিব্বত স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ ছিল, ১৯৫০ এর ৭ নভেম্বর আক্রমণ পর্যন্ত। তা সত্ত্বেও চীন কেন তিব্বত দেশবাসীদের চৈনিক বলে, তার কারণ আছে। London Times-এর অন্য একজন সাংবাদিক Peter Hopskirk তার বিবরণ দিয়েছেন ১৯৮২-৮৩ প্রকাশিত বই "Tresspassers on the Roof of the World" বইয়ে। এই বিষয়টা আমরা পরে আলোচনা করব।

বাটালা এনকাউন্টারে নিহতদের বাড়িতে দিগ্বিজয় সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০০৮-এ দিল্লীর 'বাটালা হাউস এনকাউন্টার'-এ নিহত ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন জঙ্গিদের জন্য কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা ও মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং-এর দরদ উথলে উঠেছে। গত ৩ ফেব্রুয়ারি তিনি ওই এনকাউন্টারে মৃত দুই ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন জঙ্গি আতিফ এবং ছোটা সাজিদ-এর পরিবারের লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলার সাঞ্জারপুরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন, "বাটালা হাউস এনকাউন্টারের ঘটনা খুবই দুঃখজনক। ছেলেগুলোর মাথায় গুলি লেগেছে। এনকাউন্টার-এ এটা হতে পারে না। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উচিৎ ছিল তদন্তের সময় শোকগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে গুরুত্ব দিয়ে কথা বলা।"

২০০৮-এর ঘটনার বিষয়ে ২০১০-এ একটি সর্বভারতীয় ও ক্ষমতাসীন দলের সর্বভারতীয় নেতার এই আচরণ ও বক্তব্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। প্রধান বিরোধী দল বিজেপির মুখপাত্র রবিশঙ্কর প্রসাদ এই ঘটনাকে কংগ্রেস দল ও নেতাদের কদর্য ভোটব্যাঙ্ক-রাজনীতি বলে মন্তব্য করেছেন। দ্বিগ্বিজয়ের তদন্ত দাবী করাকে রবিশঙ্কর প্রসাদ ব্যাধিগ্রস্ত রাজনৈতিক মানসিকতা বলে উল্লেখ করে নিরাপত্তাবাহিনীর নৈতিক মনোবলকে খাটো করার প্রয়াস বলে অভিহিত করেছেন। শ্রীপ্রসাদ আরও বলেছেন, 'এবার তাহলে কংগ্রেসী নেতারা পাকিস্তানে গিয়ে সীমাপার থেকে আগত সন্ত্রাসবাদীদের বাড়িতে সাক্ষাৎ করতে যাবেন।' তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে কেবল হিন্দু নয়, মুসলমানরাও নিহত হচ্ছেন। কংগ্রেস নেতারা হয়ত ভাবছেন, এরফলে সংখ্যালঘু ভোট তাদের ঝুলিতে উপচে পড়বে। শ্রীপ্রসাদ সাংবাদিকদের বলেছেন, মুম্বাইয়ে (২৬/১১) জঙ্গি হানাতে যে শতাধিক ভারতীয় নিহত হয়েছেন তাদের কজনের বাড়িতে দিগ্বিজয় সিং গিয়েছেন?'

প্রসঙ্গত, ওই বাটালা হাউস এনকাউন্টারে দিল্লী পুলিশের নির্ভীক তরুণ অফিসার মোহনচাঁদ শর্মা সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। এবছর তাঁকে মরণোত্তর পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনে।

এদিকে শর্মাকে গুলি করে যারা পালিয়ে গিয়েছিল এবং পুলিশের খাতায় ফেরার ছিল, তাদের অন্যতম সন্ত্রাসবাদী শাহজাদ আহমেদ সম্প্রতি ধরা পড়েছে। এদিকে ধৃত শাহজাদ দিল্লীর পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চে র হেফাজতে জবানবন্দী দিয়ে ২০০৮-এর এনকাউন্টারের দায় কবুল করেছে। এই জবানবন্দীতে

দিগ্বিজয় সিং

নিহত মোহনচাঁদ শর্মা

২০০৮-এ দিল্লীর ধারাবাহিক বিস্ফোরণে সে নিজে এবং গা-ঢাকা দেওয়া বারোজন সঙ্গীর জড়িত থাকার কথাও স্বীকার করেছে। ক্রাইম ব্রাঞ্চ সূত্রে জানা গিয়েছে—২০০৮-এর ১৯ সেপ্টেম্বর বাটালা হাউসের ফ্ল্যাট এল-১৮ থেকে শাহজাদ পালিয়ে ট্রেনে করে মুম্বাই-এ চলে গিয়েছিল। পরে সে নেপালে যায়। কেননা তার সীমাপারের মনিবরা তাকে নেপালে বেস গড়ে সেখানে থেকেই অপারেট করতে বলেছিল। শাহজাদ আরও জানিয়েছে, সে সঙ্গী জুনেদকে নিয়ে ট্রেনে মুম্বাইয়ে যায়। সেখানে চারদিন থেকে আজমগড়ে যায়। এক আত্মীয়ের বাড়িতে ওঠে, কেননা পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি ছিল তার বাড়িতে। সে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে পাকিস্তানে তার মুরুব্বিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তখন তাকে নেপাল থেকে অপারেট করতে বলা হয়। কয়েক সপ্তাহ আগে সে ভারতে ফিরে আজমগড়, গোরখপুর ও দেওরিয়ার বিভিন্ন গ্রামে যোগাযোগ করে। সে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন জঙ্গিদের নতুন করে জোটবদ্ধ করছিল নতুন অপারেশনের জন্য।

দিল্লী পুলিশের জনৈক সিনিয়র পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা এক ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন জঙ্গির ফোন ট্যাপ করে তাকে নির্দিষ্ট করে। তারপর উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলার খালিসপুর থেকে শাহজাদকে গ্রেপ্তার করে।

এদিকে দিগ্বিজয়ের বক্তব্য থেকে কংগ্রেস দল নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। ঘটনা পরম্পরা অনুধাবন করে দিগ্বিজয়ও ঢোক গিলে তখন বলেছেন, 'আমি তো তদন্ত করতে আসিনি। আমি বলতেই পারি না এনকাউন্টার ভুয়ো অথবা সত্যি। কংগ্রেসের মুখপাত্র অভিষেক মনু সিংভির বক্তব্য ছিল'দিগ্বিজয় আজমগড়ে ঘটনার প্রকৃত তথ্য জানতে গিয়েছিলেন।'

আজমগড় থেকে ফিরেই দিগ্বিজয় দলের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক রাহুলকে এবং দলীয় সভানেত্রীকে তার আজমগড় সফরের যৌক্তিকতা বুঝিয়েছেন। এর ফলে খুব শীঘ্রই যুবরাজ রাহুল আজমগড় যাবেন বলে জানা গেছে। তবে তিনি সরাসরি কারও বাড়িতে নয়, আল্লামা শিবলি প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত 'শিবলি ন্যাশন্যাল কলেজ অফ্ আজমগড়' কলেজে যাবেন। এতে ছেলে-মেয়ে উভয়কেই মোহিত করা যাবে। কিন্তু তাতে 'আজমগড়'-এর জেহাদিদের আঁতুড়ঘর আখ্যা কি মোছা যাবে? এখন তো মনে হচ্ছে দিগ্বিজয়ের আজমগড় সফরে দলের অন্তরাত্মার অনুমোদন থাকাটাই স্বাভাবিক। মুসলমান নেতারাও অনেক চেষ্টা করেছিলেন আজমগড়ের গা থেকে জেহাদী কলংকের দাগ মুছে ফেলতে। পারেননি। সেই পথেই যাচ্ছে সোনিয়া কংগ্রেসও। এসময় ৫৫টি সন্ত্রাসী ঘটনায় আজমগড়ের ২৯ জন যুবকের বিরুদ্ধে মামলা আদালতে চালু আছে। এ থেকেই ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করা যেতে পারে।

মাওবাদীদের মধ্যে জনজাতি অ-জনজাতি দ্বন্দ্ব প্রকট হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাংলায় মাওবাদীদের মধ্যেই জনজাতি ও অজনজাতি—এই মেরুকরণের ইঙ্গিত মিলেছে। বাংলায় সাম্প্রতিককালে মাওবাদীদের উত্থান গত ১৫ বছরে হয়েছে। তারমধ্যে এটাই প্রাথমিক ফাটল বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। মার্শাল নামে প্রথম সারির জনৈক মাওবাদী নেতার সঙ্গে মাওবাদী দলের পলিটব্যুরোর প্রভাবশালী সদস্য কিষেণজী ওরফে কোটেশ্বর রাও-এর মতানৈক্যের খবর কিছু কিছু ইংরেজী দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। মার্শালকে জঙ্গলমহলে মাওবাদী সন্ত্রাসের প্রমুখ কারিগর বলা যায়। এক দশকের বেশি সময় ধরে মাওবাদী গেরিলা হিসেবে লড়াই করার পর মার্শাল এখন কিষেণজীর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। তার কথায় জঙ্গলমহলে কিষেণজীরা তো বহিরাগত। আর তার মতো বনবাসী জনজাতিরা যারা লড়াইয়ের ময়দানে সামনের দিকে থাকেন তাদেরকে নীতি-কর্মসূচী স্থির করার সাইড লাইনে ঠেলে দেওয়া হয়। কিষেণজীরা চলে আসেন সামনে। এই প্রথম মাওবাদীদের মধ্যে জনজাতি ও অজনজাতি বিভেদ দেখা দিয়েছে বলে জানা গেছে। মার্শালের আসল নাম গুরুচরণ কিস্কু। জন্ম পুরুলিয়ার গ্রামে। এখন তিনি নিজেই জনজাতিদের কল্যাণে আলাদা বাহিনী নিয়ে লড়াই চালাবেন বলে ঠিক করেছেন। তার দাবী, তার হাতে ১৫০ জন সশস্ত্র ক্যাডার রয়েছে। বেশকিছু জনজাতি নেতা এখনও মাওবাদীদের সঙ্গে আছেন।

সি পি আই (মাওবাদী) গঠনের পর এখনও পর্যন্ত ১১টি মাওবাদী ছোট ছোট গোষ্ঠী হিসাবে তারা বিভক্ত হয়ে গেছে। তার অর্দ্ধেকই ঘটেছে ঝাড়খণ্ডে। তবে তাদের বেশির ভাগই তোলাবাজদের দলে পরিণত হয়েছে।

মার্শালের মতো বিদ্রোহীরা সরকার বা নিরাপত্তাবাহিনীর হাতের ব্রহ্মাস্ত্র হতে পারে। জঙ্গলমহলের এক গভীর জঙ্গলে নিজের ডেরায় দেহরক্ষী পরিবৃত হয়ে মার্শাল এক ইংরেজি দৈনিকের সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

মার্শাল বাংলায় এক ভয়াল বিধ্বংসী আক্রমণের (২০০৩-এ বান্দোয়ান থানা আক্রমণ ও ধ্বংস) ঘটনায় জড়িত। ওই ঘটনায় থানার ওসি এবং অন্য পাঁচজন পুলিশকর্মী নিহত হয়েছিল। মার্শাল এখন বিশ্বাস করেন, যে পথে মাওবাদী আন্দোলন চলছে তাতে করে শেষপর্যন্ত লালগড়ের জনজাতিদের সমস্যার সমাধান হবে না। তার মতে মাওবাদীরাও অন্য রাজনৈতিক দলের মতোই ক্ষমতালোভী। তারা তাদের

বিক্ষুব্ধ নেতা মার্শাল

প্রভাবাধীন এলাকার সম্প্রসারণেই বেশি উদ্যোগী। স্থানীয় মানুষের উন্নয়নে তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই।

মার্শাল নিজেই কিষেণজীর অত্যধিক হিংসার সাহায্য নেওয়াকে সমালোচনা করেছেন। বলেছেন সাংগঠনিক সর্বোচ্চ স্তরে নেতাদের সঙ্গে শশধর মাহাত অথবা বিকাশ ওরফে মনসারাম হেমব্রমের মতো তৃণমূল স্তরের কর্মীদের কোনও গুরুত্ব নেই। এই প্রথম তার মুখেই বিকাশের প্রকৃত নাম শোনা গেল। বিকাশ মিডিয়ার কাছে বিকাশ নামেই পরিচিত।

মার্শাল এখন নিজেই এক সশস্ত্র গোষ্ঠী চালাতে আগ্রহী। তার আরও বক্তব্য যে, "মাওবাদী পলিটব্যুরো সদস্য কিষেণজী জঙ্গলমহলের মানুষকে প্রতারিত করেছেন। আশির দশকের শেষদিকে আমি মাওইস্ট কমিউনিস্ট সেন্টারে যোগ দিই। নেতারা আমাকে বুঝিয়েছিলেন, রাষ্ট্রশক্তি এবং লোভী নেতাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে সংগ্রাম করতে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ওই নেতাদের কোনও শ্রদ্ধাই ছিল না। কিন্তু দেশের অন্যান্য স্থান থেকে জঙ্গলমহলে যে মাওবাদী নেতারা এলেন তাদেরও আমাদের জনজাতি মানুষ, তাদের রীতিনীতি, প্রথা বিষয়ে কোনও শ্রদ্ধা-ভালোবাসা নেই।" ঝাড়খণ্ডে গিয়ে মার্শাল তিন বছর ধরে অস্ত্রশস্ত্র এবং আদর্শবাদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তারপর আরও উন্নত প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ছত্তিশগড়ে গিয়ে। মার্শাল ঝাড়খণ্ডের বুরুডিতে কিষেণজীকে সাক্ষাৎ করেছিলেন ২০০৪-এ সি পি আই (মাওইস্ট) গঠনের আগে। ৭ জনের বিহার-ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ক্ষেত্রীয় কমিটি গঠনের শুরু থেকেই মার্শাল তার অন্যতম সদস্য। তাকে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পশ্চিম ঝাড়খণ্ডের সিংভূম জেলাতে ক্যাডার রিক্রুটের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। মার্শালের সাবধানবাণী হলো অত্যধিক পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জঙ্গলমহলে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করবে। বস্তুত এখনকার জঙ্গল এলাকার পরিস্থিতি প্রায় সেরকম দাঁড়িয়েছে। সিপিএম-এর হার্মাদবাহিনী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মোকাবিলায় মাওবাদীরা স্থানীয় যুবকদের হাতে ব্যাপকহারে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে। তারা বন্দুকের যথেচ্ছ ব্যবহার করছে, স্থানীয় মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা আদায় করছে। অথচ ওই যুবকদের রাজনৈতিক বা আদর্শগত প্রশিক্ষণ দিচ্ছে না। এরকমই অভিযোগ মার্শালের। দলবিরোধী কাজের অভিযোগে সিপিআই (মাওবাদী) থেকে বহিস্কৃত হওয়ার পরও মার্শাল সশস্ত্র সংগ্রামই চালিয়ে যেতে চায়। মূল স্রোতে ফিরতে চায়না। সিপিএম এবং কিষেণজী-উভয়কেই মার্শাল ঘৃণা করে বলে জানিয়েছে।

লালগড় এলাকার সিনিয়র মাওবাদী নেতারা মার্শালকে তাদের দল থেকে ঝেড়ে-মুছে ফেলেছে। তাদের কথায় বেশির ভাগ জনজাতিরা তাদের সঙ্গে, মার্শালের পিছনে নেই। মার্শালের বহিষ্কার কোনও প্রভাব দলের উপর পড়বে না। তবে তাদের আশঙ্কা, পুলিশ-প্রশাসন মার্শালের মতো বিচ্ছিন্ন নেতাদের অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে কাজে লাগাতে পারে। তাহলে তাদের পক্ষে সমস্যা হবে।

Swastika
22 February - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

অপ্রস্তুত ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পুণের 'জার্মান বেকারী' কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কারণ ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'কমব্যাট ফোর্স' পুরোপুরি প্রস্তুতিবিহীন অবস্থায় রয়েছে। ভারতবর্ষের প্রতিটি বিস্ফোরণে পাক-মদতপুষ্ট জঙ্গিদের যোগাযোগ সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। এবং বর্তমানে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পাকিস্তানকে বিদেশ সচিব পর্যায়ে এক টেবিলে বসবার যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তা পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলবে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা। পাকিস্তান ২৬/১১-এর পর থেকেই চাইছে—ভারত তাদের সঙ্গে আলোচনায় না বসুক। তাহলে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতে হামলার পাক-দায়ের হাত থেকে রেহাই পাবার একটা যুৎসই অজুহাত খুঁজে পাওয়া যাবে। আর ভারত সরকারও চরম ভুল করে আলোচনায় বসতে চাইছে। কূটনৈতিক মহলের অনুমান—সেই আলোচনা ভেস্তে দিতেই পুণেতে পাক-মদতপুষ্ট লস্কর জঙ্গিরা হামলা চালিয়েছে।

এভাবেই বর্তমান ভারত-সরকারের একের পর এক হঠকারী সিদ্ধান্তে কূটনৈতিক লড়াই-এ পাকিস্তান বারেবারেই দু'কদম এগিয়ে থাকছে। সম্প্রতি সেনাবাহিনীর একটি গোপন বৈঠক থেকে রীতিমতো আশঙ্কাজনক একটি তথ্য উঠে এসেছে। আনারস-আকৃতির যে হ্যাণ্ড গ্রেনেডগুলো আমাদের সেনাবাহিনী ব্যবহার করে থাকে তার অধিকাংশই অকেজো। ৩৬-এম জাতীয় এই বিস্ফোরক এদেশের সেনাবাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই ব্যবহার করে আসছে। ৩৬টি গোলা-বারুদ সমৃদ্ধ উপকরণ দিয়ে এই হ্যাণ্ড-গ্রেনেডটি তৈরি হয়। কিছুদিন আগে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা এহেন হ্যান্ড-গ্রেনেডটি ছুঁড়তে গিয়ে 'আবিষ্কার' করেন বস্তুটি মোটেও ফাটছে না। এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্যি, ভারতীয় সেনাবাহিনী চীন ও পাকিস্তানের তৈরি হ্যান্ড-গ্রেনেডই ব্যবহার করে। স্বাভাবিকভাবেই সেই গ্রেনেডগুলো যে জঙ্গিদের হাতে পড়েই 'পরিশীলিত' হয় তা বলাই বাহুল্য।

শুধুমাত্র একা অকেজো গ্রেনেডেই রক্ষা নেই, দোসর হিসেবে উদিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের অকর্মণ্য রাইফেল। ৯ মিলিমিটার কার্বাইন, ৭.৬২ মিলিমিটার লাইট মেশিনগান আধুনিক যুগে আর মানায় না। ৫.৫৬ মিলি মিটার ইনসাস রাইফেল নিয়েও অসন্তুষ্ট সৈনিকরা। একযুগ আগেই সেনাবাহিনী চেয়েছিল আধুনিক রাইফেল। কিন্তু বারোটি বছর কেটে গেলেও তাদের চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে দুস্তর-ব্যবধান থেকেই গেছে।

পদাতিক সৈন্যবাহিনীর অবস্থাটা বেশ করুণ। গত বছর এনিয়ে সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টার থেকে একটি 'প্রেজেনটেশন' প্রস্তুত করা হয়েছিল। তাতে পদাতিক সৈন্যবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র কিনতে ৩৪,০০০ কোটি টাকা প্রয়োজন বলে জানানো হয়েছিল। বর্তমানে ৩৮০ ব্যাটেলিয়ন পদাতিক সৈন্যবাহিনী রয়েছে, রাষ্ট্রীয় রাইফেল ব্যাটেলিয়ন আছে ৬৪টি। প্রসঙ্গত, প্রত্যেক ব্যাটেলিয়নে সৈন্যসংখ্যা ৮৫০। সবচেয়ে বড় কথা এর মধ্যে 'অদক্ষ' সৈনিকের সংখ্যাও বেশ বড় পরিমাণে আছে। সেনাবাহিনী সূত্রের খবর, প্রায় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ মতো 'বিপুল পরিমাণে' অদক্ষ সৈনিক রয়েছেন, যাঁরা জঙ্গিদের সঠিক নিশানায় গুলিবিদ্ধ করতে পারেন না।

ভারতীয় সেনাবাহিনী মনে করছে ২০২৫-এর মধ্যে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে 'দুটি যুদ্ধক্ষেত্রে' পাকিস্তান ও চীন অবতীর্ণ হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোতে এনিয়ে বর্তমান প্রয়োজনীয়তার নিরীখে অন্তত ৫০ শতাংশ অর্থের সংস্থান না করলে ও আধুনিক অস্ত্র যোগাড়ের বন্দোবস্ত না হলে ভবিষ্যতে ভারতের নিরাপত্তা সঙ্কট তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করবে। এব্যাপারে ভারত-সরকারের গয়ং-গচ্ছ মনোভাব যে আগামী দিনে আরও বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনবে তা নিয়ে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা সবাই একমত।

সুরক্ষার চাওয়া-পাওয়া	
অবহেলায় সুরক্ষা	সরকারি বদান্যতায় নিরাপত্তা আজ চরম উপেক্ষার শিকার।
চাহিদাঃ	৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ব্যালিস্টিক হেলমেট।
তারিখঃ	প্রথম প্রস্তাব আসে ২০০৫ সালে।
বর্তমান স্থিতিঃ	এনিয়ে প্রতিরক্ষা দপ্তরের বক্তব্য-প্রতিটির জন্য ৬০০০ টাকা খরচ। এটা নাকি বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে।
চাহিদাঃ	কম-ওজনের বুলেট-প্রুফ জ্যাকেট।
তারিখঃ	প্রথম প্রস্তাবিত হয় ২০০৭-এ।
বর্তমান স্থিতিঃ	৮০০০টির অর্ডার দেওয়া হয়েছে। বাকি আছে ১ লক্ষ ৮১ হাজার!
চাহিদাঃ	৩০,৬৩৪টি জেনারেল-৩ এন ভি ডি (নাইট ভিশন ডিভাইসেস)।
তারিখঃ	২০০৬ থেকেই দাবি উঠেছে এবিষয়ে।
বর্তমান স্থিতিঃ	গত বছরে এই ব্যাপারে ভুল বেরোনোর পরেই তা ঠাণ্ডাঘরে চলে যায়।
চাহিদাঃ	৮৪ মি.মি. রকেট-লঞ্চার।
তারিখঃ	২০০৭-এ ৫০,০০০ রাউন্ড রকেট লঞ্চারের প্রস্তাব দেওয়া হয়।
বর্তমান স্থিতিঃ	সেই প্রস্তাব এখন ঠাণ্ডা ঘরে।

যানে চাওয়া-পাওয়া	
গজেন্দ্র গমন	আধুনিক দ্রুতগতির ও সুরক্ষিত যানের বড়ই অভাব পদাতিক সেনাবাহিনীর।
চাহিদাঃ	২২৫টি মাইন প্রোটেক্টেড ভেহিকল (এম পি ভি)।
তারিখঃ	২০০৫-এ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ড এনিয়ে 'অর্ডার' জারি করে।
বর্তমান স্থিতিঃ	২৮ মাস দেরীতে জোটে 'ডেলিভারি'।
চাহিদাঃ	৬৪টি 'স্নো-স্কুটার'।
তারিখঃ	২০০০ সালেই পুরনো স্কুটারের পরিবর্তে দরকার হয়ে পড়ে নতুন স্কুটারের।
বর্তমান স্থিতিঃ	প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এখন আবার নতুন করে 'টেন্ডার' ডাকতে চাইছে।

অপেক্ষার চাওয়া-পাওয়া	
সুদীর্ঘ অপেক্ষা	ব্যুরোক্র্যাটিক গোলকধাঁধায় অস্ত্র-শস্ত্রের ন্যূনতম চাহিদাটুকুই গেছে হারিয়ে।
চাহিদাঃ	ইনসাসের পরিবর্তে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় রাইফেল।
তারিখঃ	প্রথমবার এটি প্রস্তাবিত হয় ২০০৮-এ।
বর্তমান স্থিতিঃ	প্রতিরক্ষামন্ত্রক এখনও এব্যাপারে অনুমতি দেয়নি।
চাহিদাঃ	৯ মি.মি. কার্বাইনের পরিবর্তে ২ লক্ষ আধুনিক কার্বাইন।
তারিখঃ	প্রথম এনিয়ে প্রস্তাব আসে ২০০৭-এ।
বর্তমান স্থিতিঃ	বিগত দু'বছরে কোনও উচ্চ-বাচ্য নেই।
চাহিদাঃ	৩৬-এম গ্রেনেডের পরিবর্তে আধুনিক যুগের গ্রেনেড।
তারিখঃ	এই পরিবর্তিত মডেলে ২০০৮-এই সায় দেয় অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ড।
বর্তমান স্থিতিঃ	অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ড প্রতিবছর মাত্র ৫০,০০০ টাকা দিতে পারে নতুন গ্রেনেড কিনতে।
চাহিদাঃ	১৫ হাজার নতুন মেশিনগান সাধারণ কাজে লাগানোর জন্য।
তারিখঃ	২০০৮-এ এই দাবি ওঠে।
বর্তমান স্থিতিঃ	এখনও অবধি পুরো বিষয়টা পরিষ্কার হলো না।
চাহিদাঃ	১০৮৭টি হাল্কা-ওজনের অ্যান্টি মেটিরিয়াল রাইফেল (এ এম আর)।
তারিখঃ	২০০৬ থেকে বিষয়টা স্রেফ ফাইলবন্দী অবস্থায় পড়ে আছে।
বর্তমান স্থিতিঃ	আজ অবধি মেলেনি অনুমোদন।

প্রকাশিত হবে ১ মার্চ '১০
স্বস্তিকা
প্রকাশিত হবে ১ মার্চ '১০

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুসলিম সংরক্ষণ নিয়ে মুখ খুললেন প্রবীণা লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর মন্তব্য হয়তো এই বিতর্কে নতুন ইন্ধন যোগাবে। চোখ রাখুন স্বস্তিকা-য়। সঙ্গে থাকছে ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিতের গণতন্ত্রের অপব্যবহার নিয়ে একটি বিশেষ প্রবন্ধ। শুধুমাত্র স্বস্তিকা-য়।

।। নিয়মিত আকারেই প্রকাশিত হবে।। দাম একই থাকছে।।
সত্বর কপি বুক করুন

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম এর ..... পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101
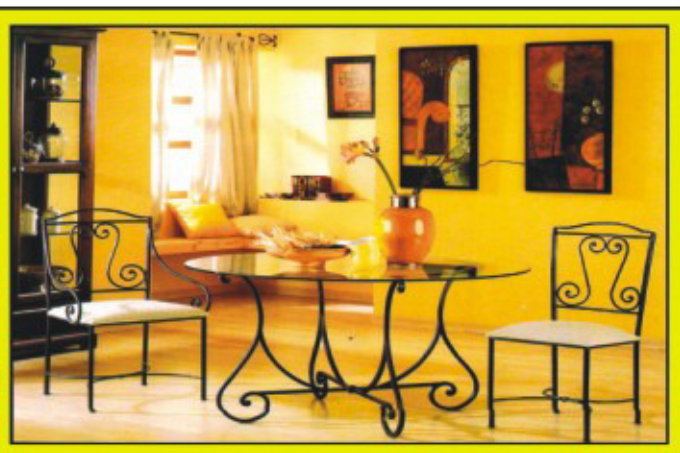

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com